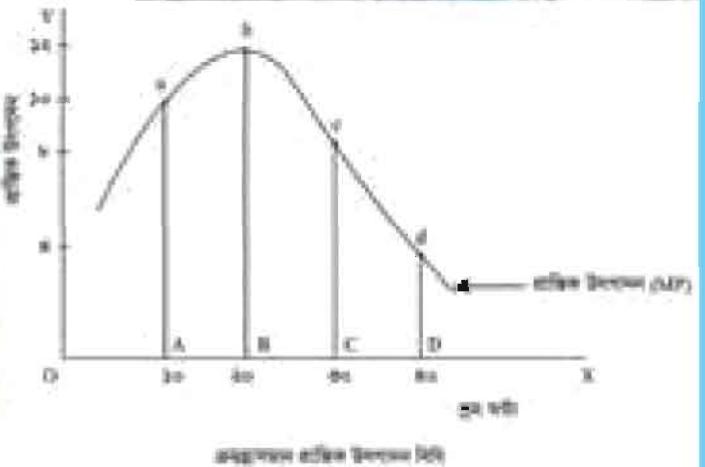
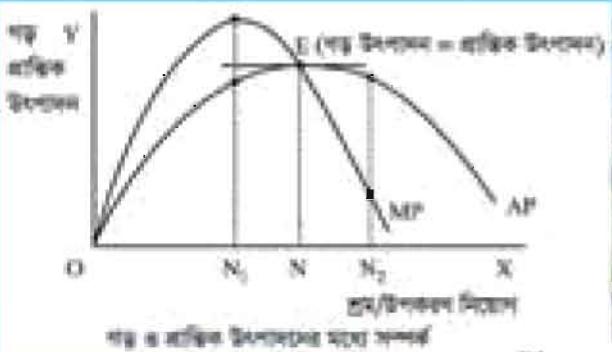


অর্থনীতি

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত

অর্থনীতি নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংক্ষরণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক এম. এম. আকাশ

প্রথম সংক্ষরণ রচনা
মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
ড. মোঃ আজম খান
মোহাম্মদ ফখরুল আলম

প্রথম সংক্ষরণ সম্পাদনা
প্রফেসর মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন
প্রফেসর মোঃ আমির হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রশীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্পণাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বরূপ-প্রকৃতি অবস্থিত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অতীব জরুরি বিষয়। সেই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে নবম-দশম শ্রেণির অর্থনীতি শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে আধুনিক অর্থনীতির পরিচয় ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে উপযোগ, চাহিদা, উৎপাদন, বাজার, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল উপাদান সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়ক হবে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রশীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহ
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	অর্থনীতি পরিচয়	১-১৪
দ্বিতীয়	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	১৫-২৭
তৃতীয়	উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য	২৮-৪১
চতুর্থ	উৎপাদন ও সংগঠন	৪২-৫৬
পঞ্চম	বাজার	৫৭-৬৯
ষষ্ঠ	জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ	৭০-৮০
সপ্তম	অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	৮১-১০১
অষ্টম	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১০২-১১৮
নবম	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ	১১৯-১৩৫
দশম	বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা	১৩৬-১৫২

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতি পরিচয়

Introduction to Economics

জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অবিবাদ অর্থনৈতিক সঞ্চায় করে। মানুষ আজীবন নানাবিধ বাধা পেরিয়ে এসিয়ে চলে। মানুষের চলার পথের অর্থনৈতিক সমস্যা বা বাধা অতিক্রম করতে অর্থনীতি বিষয় নানাভাবে সহায়তা করে। মানুষ, সমাজ বা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতি বিষয় বিশেষ সূচিকা গালন করে। অর্থনীতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা শেখা সে জন্যই উন্নতগুর্গু। এ অধ্যায়ে অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা; অর্থনীতির সংজ্ঞা ও নীতি; আঁড়ের বৃত্তাকার ধৰাব এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠশেবে আমরা-

- অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব;
- দৃঢ়াশ্যতা ও অসীম অক্ষাবের পারম্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব এবং
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা মূল্যায়ন করতে পারব।

১.১ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

আজকের যে অর্থনীতি আমরা পড়ি, তা পূর্বে এতটা জটিল ছিল না। সনাতন বা আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। খাবার দাবার, কাপড় চোপড় এবং বাড়িঘর- এসবই ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্য সামগ্রী বিনিয়ের রীতি ছিল খুব সীমিত। মূলত মানুষের কাণ্ডিক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। সমাজে কোনো শ্রেণিভেদ ছিল না। ‘দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ’- এই ছিল আদিম সমাজের মূলমন্ত্র। উৎপাদন ও ভোগ ছিল ঐ সমাজের প্রধান বিষয়। হ্যারত মুসা (আঃ) এর সময়ে অর্থাৎ ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব ইব্রি (Hebrew) সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে সরলভাবে কিছু আলোচনা হতো। আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন এবং অর্থনীতি তখন একসঙ্গে আলোচিত হতো। অর্থনীতি বিষয়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদন, ভোগ ও দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার বিদ্যাকেই তখন অর্থনীতি বলা হতো।

অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রিক শব্দ *Oikonomia* থেকে এসেছে। *Oikonomia* অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা (*Management of the Household*)। প্লেটো (৪২৭ - ৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন প্রিক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ বৃহত্তর পরিসরে সারা দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। মোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০-১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে, তাকে ‘বাণিজ্যবাদ’ (Mercantilism) বলা হয়। দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্ভৃতকরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু (সোনা, বুপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসিরা সে দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন। ভূমিবাদীদের মতে, কৃষি ই (খনি ও মৎসক্ষেত্রসহ) হলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে মনে করা হতো।

এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনা ক্রমশ নানা বিষয়ের সমন্বয়ে জটিল হতে থাকে। রাজনৈতিক অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” রচনা করেন। আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো অ্যাডাম স্মিথের এ বইটি।

কাজ : অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লিখ।

১.২ দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব

মানুষ যা চায় তার সবকিছু পায় না। মানুষের এই না পাওয়া-চাওয়ার নাম অভাব। মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি একজন শিক্ষার্থী। ধরো, তোমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। তোমার শার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। এভাবে দেখা যাবে তোমার অনেক কিছু দরকার। কিন্তু তোমার আছে মাত্র এক হাজার টাকা। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক কম। অর্থনীতিতে এটাকে ‘সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা’ বলে। দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষ গুরুত্ব অনুযায়ী পছন্দ বা নির্বাচন করে। পছন্দ করার প্রয়োজন না হলে অর্থনীতি বিষয়েরও প্রয়োজন থাকত না। অর্থনীতি শেখায় কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সম্ভবতা করা যেতে পারে।

দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব (Scarcity and Unlimited Wants)

চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের মূল সমস্যা। যেকোনো দ্রব্য (যেমন: বই) বা সেবাসামগ্রী (চিকিৎসা সেবা) উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু “সম্পদ সীমিত”। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সে জন্যই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না। দুষ্প্রাপ্যতার কারণ এটাই। সম্পদ অসীম হলে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিস বলেন, “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনসংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।” অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের মতে, সম্পদ সীমিত বলেই সমাজে সম্পদের সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহারের প্রশ্নাটি গুরুত্ব পায়। সূর্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসগুলোর চাহিদা অনেক। কিন্তু এগুলো পেতে আমাদের তেমন কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না। তাই এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত অভাব দেখা দেয় না। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অংশিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

১.৩ অর্থনীতির ধারণা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধি অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমষ্টিয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডে এবং জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। তখন অর্থনীতি বা Economics -এর নাম ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি বা Political Economy।

অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা : “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরণ ও কারণ অনুসন্ধান করে।” সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে উঠে। তাই সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য। স্মিথের সংজ্ঞার দুর্বলতা হলো : ১. অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে মেটাবে, এই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ নেই। ২. এই সংজ্ঞায় জাতীয় সম্পদের উপর অধিক জোর দেওয়া হলেও ব্যক্তি মানুষ ও তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা হয়েছে। ৩. সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও কী উপায়ে সম্পদ যোগাড় করা হবে তা বলা হয়নি। ৪. এই সংজ্ঞায় সম্পদ বলতে দ্রব্যকেই বোঝানো হয়েছে কিন্তু সেবা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, “অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।” অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপর্যুক্ত এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

মার্শাল শুধু মানুষের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যাই অর্থনীতির মূল সমস্যা। মার্শালের সংজ্ঞায় মানুষের এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

অধ্যাপক এল. রবিস প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক এল. রবিস অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, “অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দৃশ্ট্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।” এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের।
২. অভাব প্রৱণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত।
৩. অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
৪. সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়।
৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

রবিসের সংজ্ঞাটির সমালোচনা : ১. রবিস অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে বেশি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। ২. মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু পছন্দ করে, যা অর্থনীতিতে আলোচনা হয় না। ৩. অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য যে মানবকল্যাণ তার উল্লেখ নেই। ৪. রবিসের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক পছন্দকে আলোচনা করা হয়নি। ৫. আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞায় আসেনি। ৬. রবিস অর্থনীতিতে শুধু মূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু জাতীয় আয়, নিয়োগব্যবস্থা, বিনিয়োগ, বণ্টন ইত্যাদি আলোচনা করেননি। সবশেষে বলা যায় রবিসের সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত। অর্থনীতিতে কোনো তত্ত্বই সমালোচনার উৎখন নয়। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার পরেও রবিসের সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ এটি অর্থনীতির প্রধান সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

১.৪ অর্থনীতির দশটি নীতি

আমাদের সমাজে সম্পদ স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবেলা করতে হয়। অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ম্যানকিউটয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো-

১। মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয় (People Face Trade-Offs)

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। ২৯
উদাহরণ দিয়ে বলি, ভূমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় কর, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে

পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরপ তুমি যদি টিভি দেখ, তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে, তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন।

২। সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

তুমি যদি স্কুলে লেখা পড়ার জন্য সময় ব্যয় কর, তবে তুমি তোমার বাবার কাড়িতে তোমার বাবার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ তুমি বাড়িতে কোনো একটি অর্থনৈতিক কাজ করলে তা থেকে তোমাদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারত। কিন্তু সে সময় তুমি স্কুলে লেখাপড়া করছ। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়। সাধারণত যেসব সুযোগ থেকে তুমি বাস্তিত হচ্ছ। তার মধ্যে সবচেয়ে দামি সুযোগটিকেই সুযোগ ব্যয় বলা হয়।

৩। যুক্তিবাদী মানুষ প্রাণিক পর্যায় নিয়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)

মানুষ প্রাণিক পর্যায়ে চিন্তা করে। বিয়েবাড়িতে খাওয়া শেষে তোমরা কেউ কেউ ভাবো আরও একটু খেতে পারতাম, আবার কেউ কেউ ভাবো আর একটু কম খেলে ভালো হতো। এই অল্প একটু বেশি বা অল্প একটু কম খাওয়া হচ্ছে প্রাণিক খাওয়া। ধরো, তুমি একটি বিষয়ে A পেলে, তোমার মনে হবে আরেকটু পড়লেই A+ পেতাম। মানুষ প্রাণিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবে। ধরো, তুমি পর পর তিনটি কলা খেলে। তিনি নম্বর কলাটি হলো প্রাণিক কলা। প্রাণিক কলা খেয়ে তুমি যে তৃষ্ণি পেলে, তার নাম প্রাণিক উপযোগ। প্রাণিক বা তিনি নম্বর কলাটি পেতে তুমি যত টাকা ব্যয় করলে, তার নাম প্রাণিক ব্যয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তুমি তখনই প্রাণিক কলাটি খাবে, যখন প্রাণিক উপযোগ প্রাণিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে।

৪। মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ পেলে তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবেন। নিচ্যই তোমার ভেতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনৈতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

৫। বাণিজ্য সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)

যুক্তরাষ্ট্র সন্তায় গাড়ি তৈরি করে, তবে আমাদের রয়েছে সন্তায় পোশাক তৈরির সামর্থ। এখন আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্তা পোশাকের বিনিময়ে সন্তা গাড়ির বাণিজ্য করি তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে।

৬। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য সচরাচর বাজার একটি উভয় পথ (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম সচরাচর সংগঠিত হয়ে থাকে বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও পরিবারসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে এ সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে। চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়।

৭। সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Governments Can Sometimes Improve Market Outcomes)

বাজার ব্যবস্থা সাধারণত নানাধরণের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাজার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট একজনের বদলে বহুজনের সম্মিলিত ‘অদৃশ্য’ হাতের ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। গণদ্রব্য সরবরাহ যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অপারগতা, একচেটীয়া সম্পদের কেন্দ্রীভবন, পরিবেশদূষণ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়। বাজারের হাত অদৃশ্য হলেও, সরকারের হস্তক্ষেপ দৃশ্যমান থাকে।

৮। একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on Its Ability to Produce Goods and Services)

যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত দেশসমূহের মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৫৬১১৬ মার্কিন ডলার এবং জাপানের মাথাপিছু আয় ৪০৭৬৩ মার্কিন ডলার (উৎস বিশ্বব্যাংক)। ফলে গড় পড়তা তারা উন্নত খাবার গ্রহণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকদের কর্মক্ষমতাও বাড়ে। অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে তারা অনেক বেশি দ্রব্য ও সেবা তৈরি করতে পারে।

৯। যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায়, তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

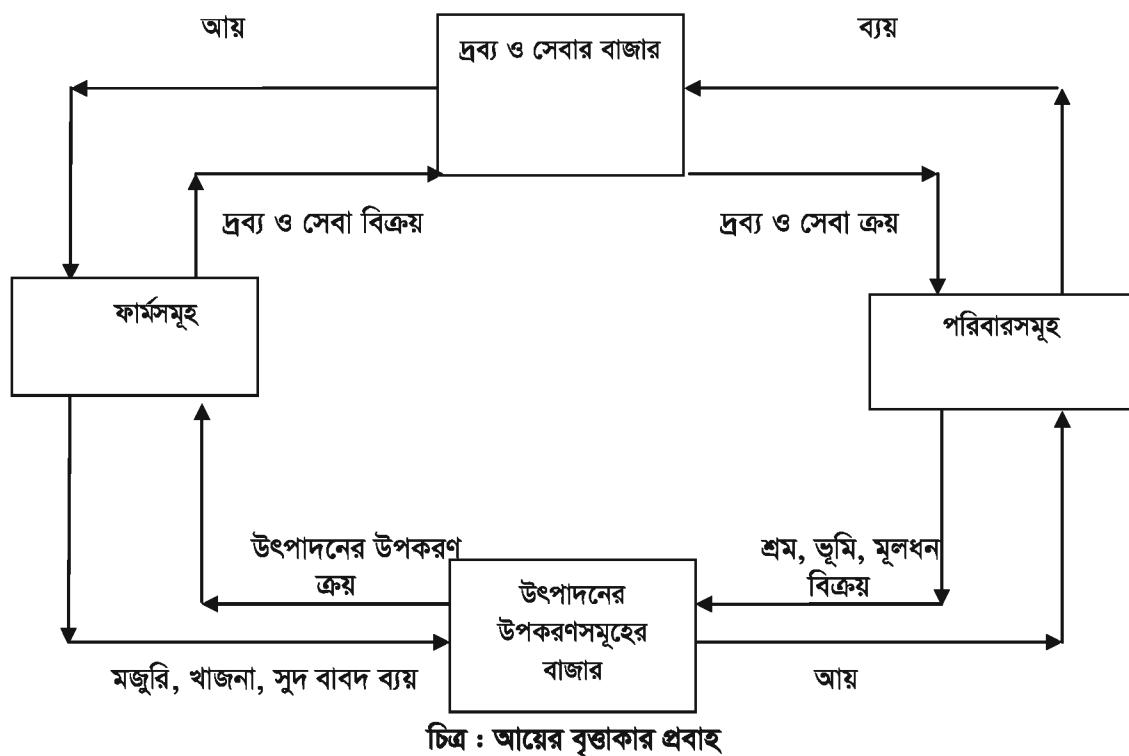
মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিক মাত্রায় মুদ্রা ছাপায়, তাহলে মুদ্রাক্ষীতি ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্যস্তর বাড়ে। মুদ্রাক্ষীতি ঘটলে অর্থের মান বা মূল্য কমে যায়। ধরো, ভূমি ৫০০/- টাকা খরচ করলে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাও। কিন্তু টাকার মান কমে যাওয়ায় ঐ সামগ্রী পেতে তোমাকে ৬৫০/- টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে; যা পূর্বের ৫০০/- টাকার চেয়ে $(650/- - 500/-) = 150/-$ টাকা বেশি। জিনিসের দাম বাড়ায় একই জিনিস কিনতে এখন বেশি মুদ্রা লাগবে।

১০। সমাজে মুদ্রাক্ষীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment)

দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাক্ষীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না—এরা হলো বেকার। সাধারণত অর্থনীতিতে মুদ্রাক্ষীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার মুদ্রাক্ষীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে।

১.৫ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটি খাত)

একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়-ব্যয় কীভাবে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়, তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।



উপরোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতিতে দু-ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। যথা- ফার্মসমূহ ও পরিবারসমূহ। ফার্ম বা ফার্মের মালিকরা উৎপাদনের উপাদানগুলো ক্রয় করেন। পরবর্তীতে সেগুলো সংগঠিত করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করেন এবং সেগুলোই বাজারে সরবরাহ বা বিক্রয় করেন। অন্য দিকে “পরিবারসমূহ” তাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন:- শ্রম, ভূমি ও মূলধন বিক্রি করে আয় বা উপার্জন করেন (শ্রমিক আয় করেন মজুরি, ভূমির মালিক উপার্জন করেন খাজনা এবং মূলধনের মালিক লাভ করেন সুদ, আর এদের সকলের খরচ মিটিয়ে উদ্যোক্তা নিজেদের জন্য বাড়তি লাভ রেখে বাজারে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিষয়টি বিক্রয় করেন। সে জন্য

উদ্যোজ্ঞার অবশিষ্ট আয়টিকে বলা হয় মুনাফা)। পরিবারসমূহ তাদের আয়-উপার্জনের সাহায্যে ফার্মের কাছ থেকে ক্রয় করেন দ্রব্য বা সেবা। এ ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা এবং আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। একেই আমরা নাম দিয়েছি “আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ”।

১.৬ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Different Types of Economic Systems)

আমরা জানি, অর্থনীতি হচ্ছে চয়ন বা নির্বাচনের (Choice) বিজ্ঞান। এটাও আমরা শিখেছি যে অর্থনীতি সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন, সর্বোচ্চ ভোগ এবং সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের জন্য সঠিক পথটি বাছাই করার নিরঙ্গন চেষ্টা চালায়, সে জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বদা তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে-

ক) আমরা কী উৎপাদন করব এবং কী উৎপাদন করব না? যেমন: আমরা কি বন্দুক উৎপাদন করব, না কি কাপড় উৎপাদন করব?

খ) আমরা যা উৎপাদন করতে চাই, তা উৎপাদন করার জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করব? কাপড় কি আমরা শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি তাঁত দিয়ে তৈরি করব, না কি পুঁজি নিবিড় মেশিনে তৈরি করব?

গ) আমরা যা উৎপাদন করব তা আমরা কাদের জন্য করব? কারা এটা ভোগ করবেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানই হচ্ছে একেক দেশের একেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কাজ। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত তিনটি পছার সম্ভান পাই এবং সেই হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে প্রধানত: তিনটি মূল পদ্ধতিতে বিভক্ত করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, এসব পদ্ধতির কোনোটিই নিখুতভাবে বিরাজ করে না। সর্বদাই বাস্তবে তারা মিশ্র অবস্থায় বিরাজ করে। নিচে তাদের নিখাদ অবস্থায় পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরা হলো-

১। বাজার পদ্ধতি বা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি (Market System or Capitalist System)

ক) এই পদ্ধতিতে সমস্ত সিদ্ধান্তই বাজারের যুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যেমন- যে পণ্যের চাহিদা বাজারে বেশি হবে এবং যার দাম বেশি হবে, সেটাই বেশি বেশি করে উৎপাদিত হবে। বাজারের আপেক্ষিক চাহিদাই নির্ধারণ করে দেবে উৎপাদনের বিন্যাস।

খ) যে প্রযুক্তিতে একটি পণ্য তৈরি করার বাজার নির্ধারিত খরচ সর্বনিম্ন, সে প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ঐ পণ্য তৈরি হবে।

গ) বাজারে যে উৎপাদন উপকরণের দাম যেরকম নির্ধারিত হবে, তার মালিকরা ঠিক সেরকম আয় ও ভোগ করবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ ব্যবস্থায় বাজার দ্বারাই উপকরণের মালিকদের এবং ক্রেতা-বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে কী উৎপাদিত হবে, কীভাবে উৎপাদিত হবে এবং উৎপাদনের বর্ণন কি রকম হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা হচ্ছেন ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত সম্পদের তথা উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তি মালিক এবং বাজারে তাদের আন্তক্রিয়ার মাধ্যমেই এসবের দাম ও অন্য সবকিছু নির্ধারিত হয়।

২। নির্দেশমূলক পদ্ধতি (Command System)

এই পদ্ধতিতে কি উৎপাদন হবে, তা নির্ধারণ করে দেয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এখানে সমস্ত সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র বা সমাজ। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ই চূড়ান্ত বিচারে কী উৎপাদিত হবে, তার জন্য কী প্রযুক্তি বাছাই হবে, কার কী দাম হবে, কার কী আয় ও ভোগ হবে ইত্যাদি সব নির্ধারণ করে দেন। তাদের এই আদেশ অনেকটা আইনের মতো সকল অর্থনৈতিক খেলোয়াড়কে মেনে চলতে হয়। তাই এই ব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক ব্যবস্থা (Command System) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থ বা মূলাফার চেয়ে সামাজিক স্বার্থ বা সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

৩। প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Traditional Economic System)

পৃথিবীতে কোনো কোনো প্রাচীন সমাজে যে আদিম অর্থনীতি রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় বা পরিকল্পনা কমিশন বা মুক্তবাজারের কোন শক্তিশালী উপস্থিতি নেই। সেসব সমাজে ব্যক্তি সচরাচর ধর্মীয় মূল্যবোধ বা আবহমানকাল ধরে চলে আসা বাবা-দাদাদের প্রথা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনা করেন। এ সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেহেতু প্রথা ও সামাজিক বিশ্বাসই সবকিছু নির্ধারণ করে দেয় (অর্থাৎ কী উৎপাদন হবে, কী ভোগ করা যাবে, কোন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, কারা বেশি পাবে, কারা কম পাবে ইত্যাদি সকল কিছু) সেহেতু এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। আমাদের দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা যুক্তরাষ্ট্রের আদিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা কোন কোন ইসলামি দেশে ইসলামি শরিয়া ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমরা এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গভূক্ত করতে পারি।

বর্তমান পৃথিবীতে মূলত বাজার ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কিছু কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ইরান ও সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু পুঁজিমুপুঞ্জভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এসব দেশে মূল বা প্রধান ব্যবস্থার চরিত্র একটি হলেও এখানে সর্বত্রই অন্য ব্যবস্থাগুলোও অংশত কাজ করে। সে জন্যই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা হয় যে পৃথিবীর সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই শেষ বিচারে একটি মিশ্র ব্যবস্থা। আমাদের বাংলাদেশেও আমরা একটি মিশ্র ব্যবস্থা দেখতে পাই। এখানে ব্যক্তি খাতে বাজারই প্রধান নিয়ন্ত্রক, রাষ্ট্র বা পরিকল্পিত সিদ্ধান্তই প্রধান নিয়ন্ত্রক, ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলিতে (যেমন ইসলামি ব্যাংক) শরিয়ার হুকুমই প্রধান নিয়ন্ত্রক, আবার এই সবগুলো ক্ষেত্রেই একে অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। বাজার, আইন, ইসলামি মূল্যবোধ কোনোটিই আমাদের অর্থনীতিতে একক বা একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)

এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লবের ফর্মা-২, অর্থনীতি, ৯ম-১০ শ্রেণি

মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

- ১। **সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে।
 - ২। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ :** ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: উৎপাদন, বিনিয়য়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।
 - ৩। **অবাধে প্রতিযোগিতা :** এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রথমে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে তখন দ্রব্যের দাম কম থাকে এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।
 - ৪। **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা :** বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকশাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।
 - ৫। **মুনাফা অর্জন :** ধনতন্ত্রে উৎপাদক সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন করে।
 - ৬। **ভোক্তার স্বাধীনতা :** প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও বুঢ়ি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে।
 - ৭। **আয় বৈষম্য :** ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কিছুটা বেকারত্ব অনিবার্য।
 - ৮। **সরকারের ভূমিকা :** এ ব্যবস্থায় সরকার আইন শৃঙ্খলা, রক্ষা, দেশরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।
- অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেউ নিঃস্বার্থভাবে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি (Socialistic or Command Economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশ শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ এবং সেগুলো সরকারি বা সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তা সরকার বা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialistic Economy)

- ১। সম্পদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ সম্পদ (জমি, কলকারখানা, খনি ইত্যাদি) ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হলো সরকার, সমবায় প্রতিষ্ঠান, ঘোষ সামাজিক দল ইত্যাদি রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করে থাকে।
- ২। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা : রাষ্ট্র বা সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সকল পরিকল্পনা করে থাকে। এই পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়।
- ৩। ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব : সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে বাজারকে প্রভাবিত করে কোনো কিছু উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে না।
- ৪। অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব : অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বহুসংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।
- ৫। ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই সরকারের এবং সামাজিক মালিকানার অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

দলগত কাজ : ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনা করে উপস্থাপন কর।

মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা (Mixed Economic System)

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, বাংলাদেশ ও ভারত ইত্যাদি।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mixed Economy)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণত মিশ্র অর্থনীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

- ১। সম্পদের ব্যক্তিগত, সমবায় ও সরকারি মালিকানা : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অবাধে ভোগ করতে পারে ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পাশাপাশি গণদ্রব্য (মহাসড়ক) ও সেবা (স্বাস্থ্যসেবা) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানত সরকার পরিচালনা করে।

- ২। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ :** মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বণ্টন ও ভোগসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।
- ৩। **সরকারি উদ্যোগ :** মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে।
- ৪। **মুনাফা অর্জন :** মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। তবে তা অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা নয়।
- ৫। **ভোক্তার স্বাধীনতা :** এ ব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- ধূমপান, মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ ইত্যাদি।

বিশেষ কোথাও বিশুদ্ধ ধনতত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্ব না থাকায় অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Economic System)

ইসলামের মৌলিক নিয়ম-কানুনের উপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Economy)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। **ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস :** ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতিমালা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের ধর্মীয় দর্শন, ধর্মগ্রন্থের বিধান ও ধর্মীয় প্রচলিত প্রথা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রণীত ও পরিচালিত হয়।
- ২। **সুদযুক্ত আমানত :** ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণের স্বীকৃতি নেই। এখানে ব্যাংক-ব্যবস্থায় সুদযুক্ত আমানতের ব্যবস্থা করা হয়।
- ৩। **যাকাত ও ফিতরা :** এ ব্যবস্থায় যাকাতভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে যাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে কোন অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে? মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব বলতে কী বোঝায়?
২. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।
৩. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বলতে কী বোঝায়?
৪. ধনতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
৫. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। কোন সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন?
৩. অর্থনীতির দশটি নীতি আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতির জনক কে?

ক. ডেভিড রিকার্ডে	খ. এরিস্টটল
গ. অ্যাডাম স্মিথ	ঘ. এল রবিনস
২. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উভয় পদ্ধা। কেননা এতে-
 - i. দর-কথাকষি করা যায়
 - ii. সন্তায় ভোগ্যদ্রব্য ত্রয় করা যায়
 - iii. চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও

নাবিল বাজারে চিনি কিনতে গিয়ে দেখলেন, চিনির দাম অনেক বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ক্রেতা বলল, রাস্তার ওপারে এই চিনি সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

৩. নাবিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক. ইসলামি	খ. মিশ্র
গ. ধনতাত্ত্বিক	ঘ. সমাজতাত্ত্বিক

৮. নাবিলের দেশের অর্থব্যবস্থায়—

ক. আয়বৈষম্য দেখা দেয়

খ. সুদবিহীন খণের লেনদেন হয়

গ. মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে

ঘ. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বুমি ও তার প্রবাসী বন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথন—

বুমি : প্রতি মাসে চালের খরচ বেড়েই চলেছে।

সুমি : আমার মাসিক খরচ সব সময় একই থাকে।

বুমি : তোমাদের দেশে এটি কীভাবে সম্ভব?

সুমি : কেউ ইচ্ছে করলেই এ দেশের দ্রব্যের দাম বাঢ়াতে পারে না।

ক. ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত কোনটি?

খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুমির দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমির দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. আসাদ দীর্ঘদিন ‘A’ দেশে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি মাতৃভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে এসে ছোট ভাইকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার সে তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

ক. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ।

খ. অর্থনীতিতে প্রগোদনার শুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. ‘A’ দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘A’ দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

The Important Ideas of Economics

অর্থনীতি সম্পর্কে সংযুক্ত ধারণা অর্জনের জন্য খিলু কর্মসূচি বিষয় জানা জরুরি। সম্পদ ও মূদ্রার সংজ্ঞা ও এর প্রেৰণ বিভাগ, সুবোগ ব্যব ও চৰন, আৱ, সকল, বিনিয়োগ, অৰ্থনৈতিক ও অ-অৰ্থনৈতিক কাৰ্যাবলি এবং সর্বোপৰি বাংলাদেশের মানবসম্পদের অৰ্থনৈতিক কৰ্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে সংকেতে আলোচনা কৰা হয়েছে। অর্থনীতির মূল আলোচনায় বাণিজ্য আগে এ মৌলিক ধারণাগুলো অৰ্থনীতিকে বৃক্ষকে সহায় কৰে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- অৰ্থনৈতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা কৰতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে ঝুলনা কৰতে পারব;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত কৰতে পারব;
- দ্রব্য কী তা বৰ্ণনা কৰতে পারব;
- অবাধলভা দ্রব্য এবং অৰ্থনৈতিক দ্রব্যের বা পশেৰ মধ্যে পাৰ্শ্বক্য নিৰ্ণয় কৰতে পারব;
- জ্বারী ও অজ্বারী তোগদ্রব্যের ঝুলনা কৰতে পারব;
- যথৰঙ্গী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মধ্যে পাৰ্শ্বক্য নিৰ্ণয় কৰতে পারব;
- সুবোগ ব্যব ও চয়নের ধারণা ব্যাখ্যা কৰতে পারব;
- আয়, সকল ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নিৰ্ণয় কৰতে পারব এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাৰ্যাবলিৰ খাতুণীয়াৰি ভালিকা তৈরি কৰতে পারব।

২.১ অর্থনৈতিক সম্পদ

আমরা সবাই ‘সম্পদ’ শব্দটির সাথে কমবেশি পরিচিত। আমাদের প্রতিদিনের আলোচনায় অনেকভাবে সম্পদ শব্দটি আসে। যেমন মি. সুজন অনেক সম্পদের মালিক। একজন অর্থনীতিবিদের কাছে সব জিনিস সম্পদ নয়। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য, যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাঙারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্থুগত সম্পদ। উল্লিখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয়, তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- ১। উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে। উপযোগ নেই এমন দ্রব্য বা সেবা মানুষ অর্থ দিয়ে কেনে না।
- ২। অপ্রাচুর্যতা:** কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন : নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সম্পদ নয়। তবে শ্রম ব্যবহার করে পানিকে বোতলবন্দি করলে পানিসম্পদে পরিনত হয়। অন্যদিকে জমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি -এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কাছে অপর্যাপ্ত দ্রব্য। এগুলোও সম্পদ।
- ৩। হস্তান্তরযোগ্য :** সম্পদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায়, তা-ই হলো সম্পদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হস্তান্তর বা মালিকানা বদল করা সম্ভব নয়। আবার টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সম্পদ।
- ৪। বাহ্যিকতা :** যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। কেননা এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন : কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো শারীরিক সৌন্দর্য বা চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা যাবে না। তবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে নানাভাবে এগুলোকেও বিক্রয়যোগ্য সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

উৎস বা উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিনি প্রকার। যথা-

- ১। প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রাকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন- ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি।

- ২। মানবিক সম্পদ : মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন-
শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ।
- ৩। উৎপাদিত সম্পদ : প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত
সম্পদ বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, বৃষ্টিপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

কাজ : অর্থনীতির ভাষায় নিচের কোনগুলো সম্পদ তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
গম, চাল, কবির প্রতিভা, কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা, নদীর বালি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিশেষ
সম্পর্ক থাকে। এ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

ক. কৃষি সম্পদ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে পলিসমৃদ্ধি উর্বর কৃষিজমি। আমাদের
জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে প্রায়
৯০,৯৯০ বর্গ কি.মি. চাষযোগ্য কৃষিজমি রয়েছে। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ,
ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্সু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের
প্রায় ৬৩% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৪.১০% ভাগ
কৃষি থেকে আসে।

খ. খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধি নয়। এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিস্কৃত হয়েছে, তার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ যাবৎ দেশে
২৭টি গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ৩৯.৯০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে
কেবল ২১টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হলো বাখরাবাদ,
হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশীদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংহদী), মেঘনা, শাহবাজপুর, সেমুতান,
সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, রূপগঞ্জ, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেনুগঞ্জ, মৌলভীবাজার,
বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা ইত্যাদি। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ
ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. চুনাপাথর : সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, রিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাঙারহাট ও বাগলীবাজার, সুনামগঞ্জের টেকেরহাট, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ এবং কর্বিবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে।
৩. চীনামাটি : নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় চীনামাটি পাওয়া যায়। এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. কয়লা : বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার পাঁচটি ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উৎপাদন করা হচ্ছে।
৫. কঠিন শিলা : দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। বর্তমানে এসব খনি হতে কঠিন শিলা উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।
৬. সিলিকা বালু : হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। এটি কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৭. গন্ধক : বাবুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. খনিজ তেল : সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে।
৯. তামা : রংপুর জেলার রাণীপুরে ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার স্তরে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

গ. বনজ সম্পদ

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য যেকোনো দেশের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১১.১ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন, আমেরিকায় শতকরা ৩৩.৮৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৭ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৩ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২৩.৭০ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সুন্দরবন : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে।
২. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি : এ ৪টি জেলার প্রায় ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি এলাকা জুড়ে এ বন বিস্তৃত। এ বনে সেগুন, গর্জন, গামারি, জাবুল, শিমুল, চম্পা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।
৩. মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি : ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় মিলে এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি, বনজাম, কড়ই প্রভৃতি গাছ জন্মায়।
৪. সিলেটের বনভূমি : এ বনভূমি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৪০ বর্গকিলোমিটার। এখানে শিমুল, বনজাম, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বহু রকমের গাছ জন্মায়।
৫. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি : এ বন দেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

ঘ. প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। চামড়াশিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এ সম্পদ রঞ্জনি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ঙ. শক্তি সম্পদ

কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রী।

বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে কয়লার সম্মান পাওয়া গেলেও তা এখনও উত্তোলন করা শুরু হয়নি। সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সম্মান পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আগবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও এ দেশে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে শক্তির যোগান বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও প্রচলিত উপকরণ থেকে আসে। আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কলকারখানা, গৃহকর্ম ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি। এ দেশে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। একে পানি বিদ্যুৎ বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাঙাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্যাস, তেল, কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

১. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা
২. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
৩. ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪. সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মীলফামারী

এ দেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হলো-

১. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
২. আঙগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাক্ষণবাড়িয়া
৩. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী
৪. শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট
৫. চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি যেমন, কাঠ, খড়, গোবর, পাটখড়ি, তুষ, পাতা ইত্যাদি থেকেও তাপশক্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার কুইক রেন্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ুপ্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আগবিক শক্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

চ. পানি সম্পদ

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা প্রাণী ও উক্তিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : ১. নদ-নদী, খালবিল, পুরু ও সমুদ্র, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূ-গর্ভস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদ-নদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াতব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। নদ-নদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাঢ়বে।

২.২ দ্রব্য

দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। মানুষের অভাব মেটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত সব জিনিসকে আমরা দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনৈতিক তা-ই দ্রব্য। দ্রব্যকে নানাভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায় যেমন:-

অবাধলভ্য দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন- আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। এদের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

ভোগ্য দ্রব্য : ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন, গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায়, তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায়, তাকে অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, তরিতরকারি ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

চূড়ান্ত দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- পাটুরাণ্টি, চেয়ার ইত্যাদি।

মূলধনী দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

পণ্য : যে সব দ্রব্য ও অবস্থাগত সেবা উপযোগসম্পন্ন এবং বিক্রয়যোগ্য, তাদেরকে পণ্য বলে। সকল দ্রব্য পণ্য নয়। কিন্তু সকল অর্থনৈতিক দ্রব্যই পণ্য। সকল সেবা পণ্য নয়, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক সেবাই পণ্য।

কাজ : কোনটি কোন ধরনের দ্রব্য তা উল্লেখ কর- আলো, নদীর পানি, টেবিল, জমি, অলংকার, যন্ত্রপাতি।

২.৩ সুযোগ ব্যয় ও চয়ন (Opportunity Cost and Choice)

সুযোগ ব্যয় : অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা ‘সুযোগ ব্যয়’। মনে কর তুমি একজন শিক্ষার্থী। তুমি কি প্রতিদিন সব কাজ করতে পারবে? যেমন: তুমি একই সঙ্গে অর্থনীতি পরীক্ষা এবং মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারবে না। তুমি যদি একটি কাজ করতে চাও তবে অবশ্যই ঐ সময়ে অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে না। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে কর তোমাদের এক বিষা জমি আছে। এ জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। এ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করতে চাও তবে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়— এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির ‘সুযোগ ব্যয়’ (Opportunity Cost)। সাধারণত নানারকম সুযোগ ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সুযোগ ব্যয়টিকেই অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

চয়ন : জীবন একজন কৃষক, তার তিনি বিষার একটি জমি আছে। উক্ত জমির সম্পূর্ণটিতে ধান অথবা গম চাষ করতে পারেন। এছাড়াও জমির কিছু অংশে ধান এবং কিছু অংশে গম চাষ করতে পারেন। উক্ত জমিতে শুধু ধান চাষ করলে ১২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন হতে পারে। আবার শুধু গম চাষ করলে ৮০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হতে পারে। এখন তিনি জমিটিতে কী চাষ করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। ফলে উৎপাদনের জন্য তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই নির্বাচন বা চয়ন। অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার জন্যই নির্বাচন করতে হয় এবং এটি ব্যক্তিপর্যায়ের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতার জন্য হয়ে থাকে।

কাজ : বাস্তব জীবনের সুযোগ ব্যয়সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

২.৪ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

আয় : উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে। জমির জন্য প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলে। ধার করা অর্থ বা পুঁজি ব্যবহার করার জন্য পুঁজির মালিককে যে সুদ দেওয়া হয় - সেটি তার আয়। এ ছাড়া উদ্যোগ সব খরচ মিটিয়ে যে আয় করেন, সেটিকে মুনাফা বলা হয়।

সঞ্চয় : মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

বিনিয়োগ : মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

কাজ : বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে এ রকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

২.৫ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানাবিধি কাজ করে। এসব কাজের মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা। জীবিকার জন্য কেউ কল-কারখানায়, কেউ অফিস বা কেউ জমিতে কাজ করে। জীবিকা সংগ্রহ ছাড়াও মানুষ খেলাধুলা, চিত্রবিনোদন বা সন্তান প্রতিপালনের মতো কাজও করে। আবার অনেকে সমাজবিবেচী কাজের সাথেও জড়িত থাকে। উপরের সবগুলো কাজকে আমরা অর্থনৈতিক কাজ বলব না। উপরের এ কার্যাবলি আমরা দুভাবে ভাগ করি। যেমন- ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি, খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

১০ ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে, তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন- শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাঙ্গার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপত্রিকা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে—এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা— নতুন দ্রব্য ও সেবা পণ্য সৃষ্টি করা।

খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন- পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, শখের বশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ।

২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি তৃতীয় খাতের উপর নির্ভরশীল - কৃষি, শিল্প এবং সেবা। তবে সাম্প্রতিককালে জাতীয় আয়ে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশ কমছে।

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি : বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংহানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এ দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫% মানুষ কৃষির সংগে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। জমিচাষ, বীজ ব্যবন, পানি সোচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশু পালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ : কৃষিকাজ ছাড়াও এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প ও কল-কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছেট-বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এ ছাড়া খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার কাজ করে এ দেশের অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাঙ্গারি, কবিরাজি, ঝাড়ফুক, বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ধরনের। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিচ্ছিন্ন এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কাজ : বাংলাদেশের মানুষের কৃষিসংক্রান্ত এবং কৃষিবহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২. সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৩. দ্রব্য কী?
৪. দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৫. সুযোগ ব্যয় কী?
৬. আয়ের সংজ্ঞা দাও।
৭. সম্পত্তি কী?
৮. বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়?
৯. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?
১০. অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও।
৩. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন বাচ্যন ব্যাখ্যা কর।
৪. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ?

ক. ঘরবাড়ি	খ. ডাকঘর
গ. পদ্মা নদী	ঘ. খামারবাড়ি

২. ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ। কারণ এর-

- i. অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে
- ii. স্বত্ত্ব পরিবর্তন করা যায়
- iii. সামষ্টিক মালিকানা দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাহেলার একটি সেলাই মেশিন আছে। এর থেকে তাঁর মাসিক আয় ২০,০০০/- টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয়পত্রে জমা করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

৩. রাহেলার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. সঞ্চয় | খ. মূলধন |
| গ. বিনিয়োগ | ঘ. সুযোগ ব্যয় |

৪. রাহেলার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে –

- i. পারিবারিক নিরাপত্তা বাড়বে
- ii. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে
- iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শফিকদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। তার মা তাকে ১০০০/- টাকা দিয়ে কিছু মাছ ও মাংস কিনতে বাজারে পাঠান। সে বাজারে গিয়ে দেখে পুরো টাকা দিয়ে ২ কেজি মাছ অথবা ৪ কেজি মাংস কিনতে পারে। অনেক চিন্তার পর সে ১ কেজি মাছ এবং ২ কেজি মাংস ক্রয় করে।

ক. আয় কী?

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. শফিকের মাছ-মাংস ক্রয়ের ধারণাটি কীভাবে নির্ধারিত হয়? তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. হাফিজ তাঁর কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উন্মুক্ত করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদরঘাটে তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাফিজের গুণাবলি কি সম্পদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য

Utility, Demand, Supply and Equilibrium

এ অধ্যায়ে ধনতাত্ত্বিক বা বাজারব্যবস্থার অধীনে উপযোগ, ভোগ, মোট উপযোগ ও প্রাণিক উপযোগ, ক্রমহাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধি, চাহিদা, যোগান, বাজার চাহিদা, বাজার যোগান ব্রেক্ষা ও ভারসাম্য দাম নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।



এই অধ্যায়ের পাঠশেবে আসুন-

- উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- উপযোগ, ভোগ ও ভোজন মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব;
- মোট উপযোগ যে প্রাণিক উপযোগের সমষ্টি তা গ্রহণ করতে পারব;
- ক্রমহাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধি চিহ্ন সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দাম ও যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব।

৩.১ উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তা (Utility, Consumption and Consumer)

উপযোগ : ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য অনেক দ্রব্য-সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। খাবার সামগ্ৰী, পৰিধানেৰ সামগ্ৰীসহ অনেক কিছুৱই প্ৰয়োজন হয়। এগুলো না থাকলে আমৱা স্বাভাৱিক জীবনযাপন কৰতে পাৰি না। যেমন- খাদ্য, বস্ত্ৰ, বইপত্ৰ, ডাঙৰারেৰ সেবা প্ৰভৃতি দ্রব্য ও সেবা ব্যক্তি মানুষেৰ অভাৱ মেটায়। অতএব, অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যেৰ বা সেবাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ অভাৱ পূৰণেৰ ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। উপযোগ একটি ব্যক্তিগত মানসিক ধাৰণা।

ভোগ : প্ৰতিদিন আমৱা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহাৰ কৰি বা এগুলো আমৱা ভোগ কৰি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ কৰাকে বোঝায় না। কেননা আমৱা কোনো জিনিস ধৰণ বা নিঃশেষ কৰতে পাৰি না। আমৱা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহাৰেৰ দ্বাৰা এৰ উপযোগ গ্ৰহণ কৰতে পাৰি। খেয়াল রাখতে হবে, অভাৱ মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাৱে দ্রব্যেৰ উপযোগ ধৰণ কৰা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। যেমন: আগুনে আমাৰ কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতএব, অর্থনীতিতে মানুষেৰ অভাৱ পূৰণেৰ জন্য কোনো দ্রব্যেৰ উপযোগ নিঃশেষ কৰাকে ভোগ বলা হয়।

ভোক্তা : যে ব্যক্তি ভোগ কৰে তাকে আমৱা ভোক্তা বলি। বাজাৰ অর্থনীতিতে কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ কৰাৰ জন্য যে ব্যক্তি অৰ্থ ব্যয় কৰতে প্ৰস্তুত থাকে, তাকে ভোক্তা বলা হয়।

কাজ : উপযোগ ও ভোগ্য পণ্যেৰ মধ্যে পাৰ্থক্য উদাহৰণ দ্বাৰা দেখাও।

৩.২ মোট উপযোগ ও প্ৰাণ্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility)

মোট উপযোগ

বাজাৰে গিয়ে তুমি খাওয়াৰ জন্য একাধিক আম কিনতে চাও। একটি নিৰ্দিষ্ট সময়ে ১ম আমটি কিনতে তুমি যে টাকা ব্যয় কৰ ২য়, ৩য় বা ৪ৰ্থ বাৰ আম ক্ৰয় কৰতে তা কৰ না। কাৰণ ১ম আমটি ভোগ কৰাৰ পৰ তোমাৰ আম খাওয়াৰ অভাৱ অনেকটা পূৰণ হয়ে যায়। ২য় বাৰ আমেৰ প্ৰতি তোমাৰ আকাঙ্ক্ষা বা আগ্ৰহ কমে যায়। ৩য়, ৪ৰ্থ আমেৰ ক্ষেত্ৰে আগ্ৰহ আৱে কমবৈ। এমন হতে পাৱে যে, তুমি আৱ আম কিনবে না। কাৰণ আম খাওয়াৰ প্ৰতি সে সময়ে তোমাৰ আৱ কোনো আগ্ৰহ থাকে না বা তোমাৰ কাছে অতিৱিক্ত আমেৰ উপযোগ শূন্য। আম ক্ৰয় কৰতে তোমাকে টাকা ব্যয় কৰতে হয়। ধৰি, ১ম আমটি তুমি কিনলে ৫ টাকায়, ২য় আমটি কিনতে তুমি ৪ টাকা দিতে রাজি থাকো, ৩য় আমেৰ জন্য ৩ টাকা দিতে চাও এবং ৪ৰ্থ আমেৰ জন্য ২ টাকা। এভাৱে $(5 + 4 + 3 + 2) = 14$ টাকা দিয়ে তুমি ৪টি আম কিনলে। টাকাকে উপযোগেৰ মাপকাৰ্তি ধৰলে এখানে ৪টি আমেৰ মোট উপযোগ ১৪। অতএব, কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যেৰ বিভিন্ন একক থেকে প্ৰাণ্তি তৃপ্তিৰ সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। যেহেতু অতিৱিক্ত আম থেকে ক্ৰমান্বয়ে কম তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেহেতু ভোগেৰ পৰিমাণ বাড়াৰ সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্ৰমহাসম্মান হাৰে বাড়ে।

প্রাণিক উপযোগ

মনে কর তুমি গুটি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এই অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রাণিক আম। এই প্রাণিক আম থেকে তুমি যে তৃষ্ণি বা উপযোগ পেলে, তাই প্রাণিক উপযোগ। এই আম কিনতে তুমি ২ টাকা ব্যয় করলে এখানে প্রাণিক উপযোগ হবে ২ টাকার সমান। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃষ্ণি পাওয়া যায়, তাকে প্রাণিক উপযোগ বলে।

সূচির মাধ্যমে মোট উপযোগ ও প্রাণিক উপযোগের উপস্থাপন

আমের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রাণিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৫	৫
২য়	$৫ + ৪ = ৯$	৮
৩য়	$৯ + ৩ = ১২$	৩
৪র্থ	$১২ + ২ = ১৪$	২
৫ম	$১৪ + ১ = ১৫$	১
৬ষ্ঠ	$১৫ + ০ = ১৫$	০
৭ম	$১৫ - ১ = ১৪$	-১

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ১ম আমের দাম যখন ৫ টাকা প্রাণিক উপযোগ তখন ৫ টাকা। ২য় আম কেনায় ১ম ও ২য় আমের ব্যয় ৯ টাকা। দুটি আম থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ৯ টাকা। ২য় আম থেকে প্রাপ্ত প্রাণিক উপযোগ ৪ টাকা। এভাবে ৪টি আম থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ১৪। ৪র্থ আমের প্রাণিক উপযোগ ২। এভাবে আমের বিভিন্ন একক থেকে প্রাণিক উপযোগ যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ ও -১ টাকা। ৬ষ্ঠ আমটির তোমার কাছে কোনো উপযোগ না থাকায় তুমি তা কিনবে না। আর ৭ম আমটি কিনলে তোমার মোট উপযোগ তখন কমে যাবে, যেহেতু ৭ম আমের প্রাণিক উপযোগ খণ্টাত্ত্বক।

কাজ : মোট উপযোগ ও প্রাণিক উপযোগের মধ্যে চারটি পার্থক্য লিখ।

৩.৩ ক্রমজাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

উপযোগ খেকে দেখা যাচ্ছে, তৃষ্ণি বারবার একই আম খেলে আমের অতি ভোগের আশ্রয় কমতে থাকে এবং উপযোগও কমে। উপযোগ কমে বলেই তৃষ্ণি অতিরিক্ত একক আমের জন্য কম দাম দিতে চাও। ৩০নং পৃষ্ঠার সুচিতে দেখা যাই, ৬^ম আমের জন্য প্রাণিক উপযোগ শূন্য (Zero) এবং ৭^ম আমের প্রাণিক উপযোগ অধার্থাত্বক (Negative)। অর্থাৎ একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমাগতে কমতে থাকে। সুতরাং ভোক্তা কোনো একটি দ্রুত্যা যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে এই মুভ্যের প্রাণিক উপযোগ ক্ষত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রাণিক উপযোগ কমে যাওয়ার এই প্রক্ষেপণাত্মক ক্রমজাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধি বলে।

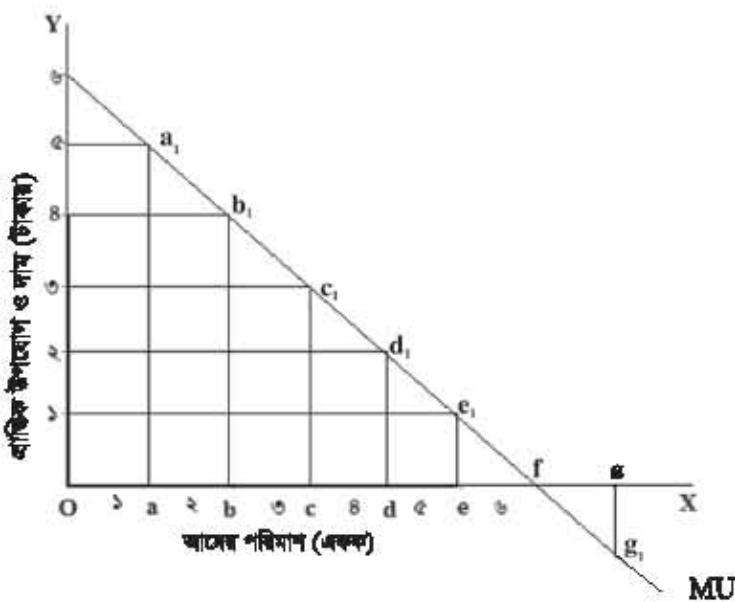
ক্রমজাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধিটি কিছু শর্ত যেনে চলে। তা হলো ক) ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবৃক্ষ সম্পর্ক; খ) ভোক্তা চাহিলে মুভ্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; গ) মুভ্যের দাম প্রাণিক উপযোগের সমান হবে; ঘ) মুভ্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, মুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না।

গ) নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমজাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধিটির ব্যাখ্যা

ক্রমজাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যাব। চিত্রের চিত্রে তৃষ্ণি অক্ষে বা OX অক্ষে আমের পরিমাপ এবং সহ অক্ষে বা OY অক্ষে প্রাণিক উপযোগ ও দাম দেখানো হয়েছে।

চিত্র :



চিত্রে তৃষ্ণি ১ম আম থেকে a_1 , পরিমাপ উপযোগ তথা প্রাণিক উপযোগ লাভ কর এবং ১ম আমের জন্য ৫ টোকা দাম দাও। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪^{র্থ} ধৰ্য এবং ৫^ম আম থেকে তৃষ্ণি যথাক্রমে bb_1 , cc_1 , dd_1 , এবং ee_1 , পরিমাপ প্রাণিক উপযোগ লাভ কর। অর্থাৎ ভোগ বাড়ার সাথে তৃষ্ণি ২য় আমের জন্য

৪ টাকা, ৩য় আমের জন্য ৩ টাকা, ৪র্থ আমের জন্য ২ টাকা, ৫ম আমের জন্য ১ টাকা দিতে রাজি থাকে। ৬ষ্ঠ আমের প্রাণ্তিক উপযোগ শূন্য এবং ৭ম আমের প্রাণ্তিক উপযোগ খণ্ডাত্তক অর্থাৎ -১.০০ টাকা। ভূমি অক্ষ রেখার f বিন্দু শূন্য প্রাণ্তিক উপযোগ নির্দেশ করে। ৭ম আমের প্রাণ্তিক উপযোগ খণ্ডাত্তক (-১ টাকা) বিধায় gg_1 তা নির্দেশ করে। এখানে $ee_1 < dd_1 < cc_1 < bb_1 < aa_1$ । এ থেকে বুবা যায়, আমের জন্য ভোগ বাড়ার সাথে সাথে তোমার কাছে অতিরিক্ত এককগুলোর উপযোগ ক্রমেই কমে যায়। এবার $a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f$ এবং g_1 বিন্দুগুলো যোগ করে প্রাণ্তিক উপযোগ বা MU (Marginal Utility) রেখা পাওয়া যায়। রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী। এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে, ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রাণ্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। সে কারণেই প্রাণ্তিক উপযোগ রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। এই বিধির পূর্বশর্তগুলো অনুপস্থিত থাকলে এই বিধি কার্যকর হবে না যেমন: ডাকটিকেট সংগ্রহ।

৩.৪ চাহিদা (Demand)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। গাড়ি, সুন্দর বাড়ি, উন্নত খাবার ইত্যাদি। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন- ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য, এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলে।

চাহিদা বিধি

তোমার মা তোমার বাবাকে বাজার থেকে ইলিশ মাছ আনতে বললেন। বাজার থেকে এসে তোমার বাবা বিরক্তির সাথে বললেন, ইলিশ মাছের দাম বেশি তাই কেনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় তোমার বাবার কাছে ইলিশ মাছের চাহিদা নেই বা কমে গেছে। আবার একদিন তোমার বাবা হঠাৎ দুটি ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি এলেন এবং হাসিমুখে বললেন আজকে ইলিশ মাছের দাম কম, তাই দুটি মাছ নিয়ে এলাম। অর্থাৎ চাহিদার সাথে দামের একটি ঘনিষ্ঠ বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব চাহিদা বিধি বা সূত্র বলতে আমরা বুঝি “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে।” [দাম (\uparrow) - চাহিদা (\downarrow) আবার দাম (\downarrow) - চাহিদা (\uparrow)]। দামের সাথে চাহিদার একপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার বুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে, আবার দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাঢ়ে। এ ধারণাটি যখন সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদা সূচি বলে। অতএব, বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা সূচি বা চাহিদা তালিকা বলে।

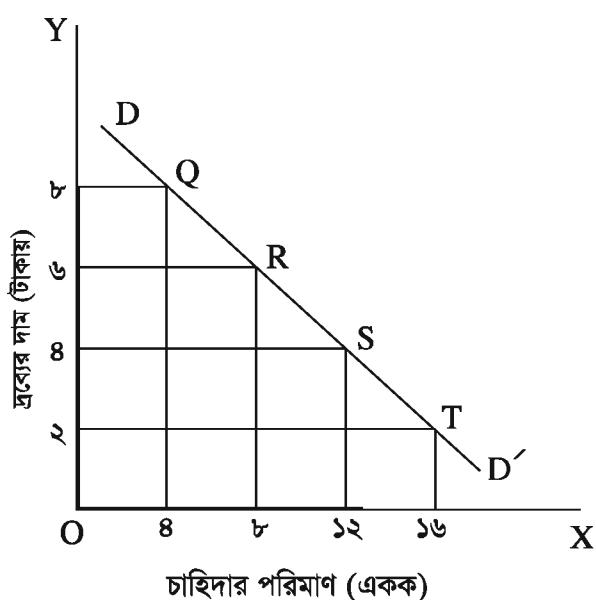
চাহিদা সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৮
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ৮ টাকা হলে একজন ভোক্তা ৪ একক দ্রব্য ক্রয় করে। দাম কমে ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৮ একক, ১২ একক ও ১৬ একক হয়। এভাবে চাহিদা সূচির মাধ্যমে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

উপরের এ চাহিদা সূচি থেকে আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি।

চাহিদা রেখা



৩৩ নং পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক। এখন OY অক্ষের ৮ সূচক এবং OX অক্ষের ৪ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর Q বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে R, S ও T বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকায় ৮ একক, ৪ টাকায় ১২ একক এবং ২ টাকায় ১৬ একক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার Q, R, S ও T বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা DD' রেখা পাব। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা। DD' চাহিদা রেখার বিন্দুগুলো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করছে।

এভাবে আমরা চাহিদা বিধি অনুযায়ী চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি। উল্লেখ্য, আমরা এখানে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করেছি।

কাজ : চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে ৩টি পার্শ্বক্য উল্লেখ কর।

৩.৫ বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন

একজন ব্যক্তির চাহিদা সূচি থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়। তেমনি বাজার চাহিদা রেখাও অঙ্কন করা সম্ভব। বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা। আমরা বোঝার সুবিধার্থে ধরে নেব একটি বাজারে ভোক্তার সংখ্যা হলো দুজন। নিচে দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো:

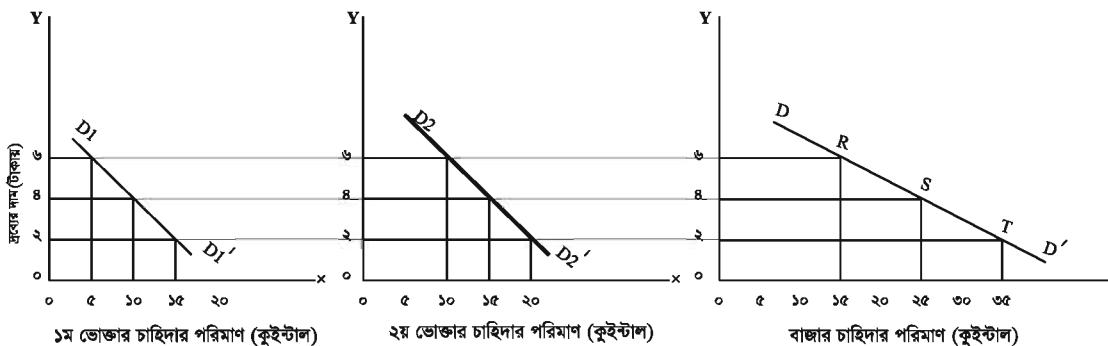
বাজার চাহিদা সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (Q_1) দ্রব্যের একক (কুইটাল)	২য় ভোক্তার চাহিদা (Q_2) দ্রব্যের একক (কুইটাল)	বাজার চাহিদা (Q) ($Q=Q_1+Q_2$) দ্রব্যের একক (কুইটাল)
৬.০০	৫	১০	১৫
৮.০০	১০	১৫	২৫
২.০০	১৫	২০	৩৫

উপরের সূচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা দেখানো হয়েছে। এ দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদা সূচি তৈরি করা হয়েছে, তা দেখানো হলো।

বাজারে কোনো দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ব্যক্তি যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত থাকে তার সমষ্টিকে যে চাহিদা রেখার সাহায্যে দেখানো হয়, তাকে বলা হয় বাজার চাহিদা রেখা।

১য় ও ২য় ভোক্তার চাহিদা রেখা পাশাপাশি যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়।



চিত্র: ১ম, ২য় ভোকার ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা

উপরের রেখাচিত্রে বাজারের ১ম ও ২য় ভোকার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হলো যথাক্রমে $D_1 D'_1$ ও $D_2 D'_2$ । দ্রব্যের দাম যখন ৬ টাকা তখন ১ম ও ২য় ভোকার চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কুইন্টাল ও ১০ কুইন্টাল এবং বাজার চাহিদা হবে (5 কুইন্টাল + 10 কুইন্টাল) বা 15 কুইন্টাল; যা বাজার চাহিদা রেখায় R বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। দাম কমে ৪ টাকা ও ২ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় ভোকার ব্যক্তিগত চাহিদা যথাক্রমে (10 কুইন্টাল + 15 কুইন্টাল) বা 25 কুইন্টাল এবং (15 কুইন্টাল + 20 কুইন্টাল) বা 35 কুইন্টাল, যা বাজার চাহিদা রেখায় S ও T বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এবার আমরা R, S ও T বিন্দু যোগ করে DD' চাহিদা রেখা অঙ্কন করি। এটি বাজার চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত।

৩.৬ যোগান (Supply)

বাজারে গেলে আমরা দেখবো বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে বিক্রেতাগণ দোকান সজিয়ে রেখেছেন। তবে আমরা এটাকেই যোগান বা সরবরাহ বলবো না। অর্থনীতিতে যোগান বলতে একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে যোগান বলে। উল্লেখ্য- একটি দ্রব্য, একটি নির্দিষ্ট সময় ও একটি নির্দিষ্ট দাম এখানে বিবেচ্য। অতএব, উৎপাদক বা বিক্রেতা বিভিন্ন দামে দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকেই অর্থনীতিতে যোগান (Supply) বলে।

যোগান বিধি

আমরা প্রতিনিয়ত বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। একজন বিক্রেতা কখন তার দ্রব্যটি বিক্রয় করতে আগ্রহী হবেন? অবশ্যই ঐ দ্রব্যের দাম যখন বাজারে সবচেয়ে বেশি, তখনই একজন বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করতে চাইবেন। ধরি, আলুর কেজি যখন ১৫ টাকা, তখন বিক্রেতা ২ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। দাম বেড়ে ২০ টাকা কেজি হলে বিক্রেতা বেশি পরিমাণে আলু সরবরাহ করতে চায়। মনে করি, তখন সরবরাহ হবে ৩০ কুইন্টাল। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং ১০
২০ দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ কমে যায়। অতএব দাম ও যোগানের সম্পর্ক সম্মুখী।

দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (যেমন, উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি ছির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত), দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দামের সঙ্গে যোগানের একাধিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন

দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের এ সময়ুক্তি পরিবর্তনকে যোগান সূচিতে দেখানো যায়।

যোগান সূচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ দেখানো হলো।

যোগান সূচি

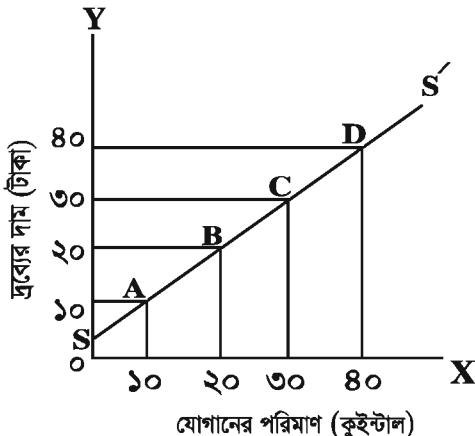
প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০
২০.০০	২০
৩০.০০	৩০
৪০.০০	৪০

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি কুইন্টালের দাম ১০ টাকা হলে তার যোগান হয় ১০ কুইন্টাল। দাম বেড়ে ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। এভাবে যোগান সূচিতে যোগান বিধি প্রতিফলিত হয়।

যোগান রেখা

কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সময়ুক্তি পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়, তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

যোগান সূচি থেকে কীভাবে যোগান রেখা অঙ্কন করা যায় তা নিচে দেখানো হলো।



চিত্রে OX বা ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগান বা পরিমাণ ও OY বা লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হলো। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা, তখন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল; যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা, তখন দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল এবং ৪০ কুইন্টাল। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C এবং D বিন্দুতে। এবার আমরা A, B, C ও D বিন্দুগুলোকে যোগ করলে পাব SS' রেখা। এটি যোগান রেখা।

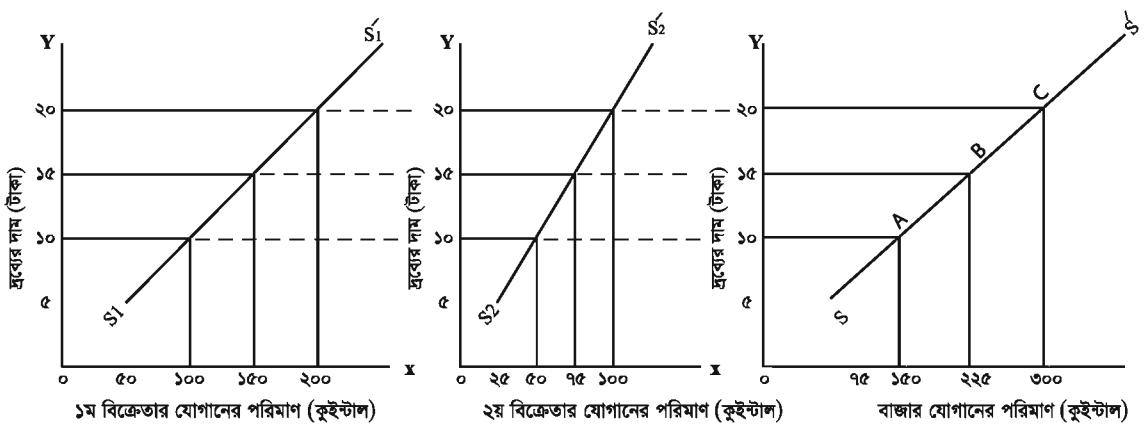
৩.৭ বাজার যোগান রেখা অঙ্কন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেন, তাকে ব্যক্তিগত যোগান বলে। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেন, তাকে বাজার যোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান সূচি যোগ করে বাজার যোগান সূচি তৈরি করা যায়। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত বাজার যোগান সূচি দেখানো হলো-

বাজার যোগান সূচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার যোগান (S_1) (কুইন্টাল)	২য় বিক্রেতার যোগান (S_2) (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (S) $S=S_1+S_2$ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০০	৫০	১৫০ (১০০+৫০)
১৫.০০	১৫০	৭৫	২২৫ (১৫০+৭৫)
২০.০০	২০০	১০০	৩০০ (২০০+১০০)

উপরের সূচিতে ১ম ও ২য় বিক্রেতার দ্রব্যের যোগান দেখানো হয়েছে। এ দুজন বিক্রেতার যোগানকৃত দ্রব্য দিয়ে কীভাবে বাজারে যোগান রেখা অঙ্কন করা যায় তা নিচে দেখানো হলো-



চিত্র : বাজার যোগান রেখা

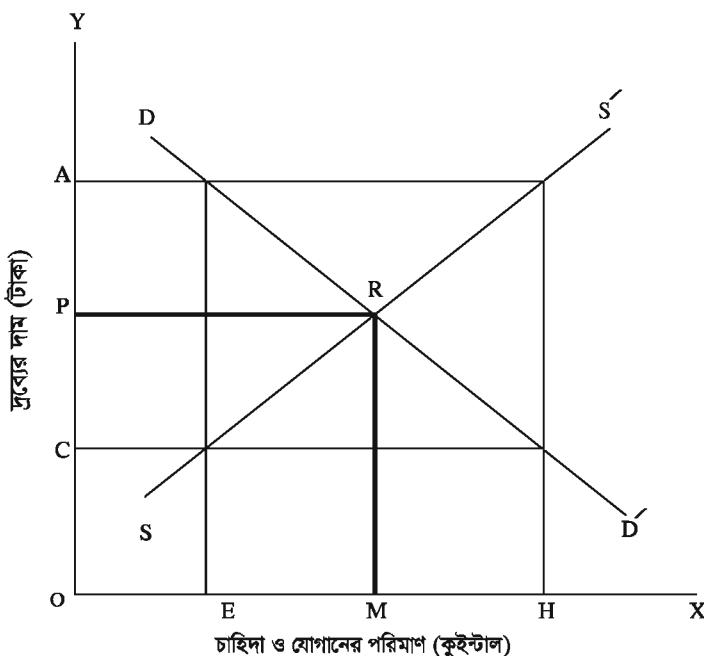
উপরের রেখাটিতে ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান রেখা হলো যথাক্রমে $S_1S'_1$ ও $S_2S'_2$ । দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা, তখন ১ম ও ২য় বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান হবে $(100+50) = 150$ কুইন্টাল; যা চিত্রে A বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম বেড়ে ১৫ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৫০ ও ৭৫ কুইন্টাল

এবং বাজার যোগান হবে $(150+75) = 225$ কুইন্টাল ; যা বাজার যোগান রেখায় B বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে । দাম আরও বেড়ে ২০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ কুইন্টাল । মোট যোগানের পরিমাণ হবে $(200+100) = 300$ কুইন্টাল । যা বাজার যোগান রেখায় C বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে । এবার A, B এবং C বিন্দু যোগ করে আমরা SS' রেখা অঙ্কন করি ; যা বাজার যোগান রেখা হিসেবে পরিচিত ।

কাজ : যোগান সূচি ও যোগান রেখার মধ্যে গতি পার্থক্য উল্লেখ কর ।

৩.৮ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর-কষাকষি করা । ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে । আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে । ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান । যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে । ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয়, তাকে ভারসাম্য পরিমাণ পরিচিত ।



চিত্র : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

উপরের রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে । রেখাচিত্রে বাজার চাহিদা রেখা DD' এবং বাজার যোগান রেখা SS' অঙ্কন করা হয়েছে ।

ধরো, OA দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে OE ও OH। এ দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ বেশি। চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হলে দাম কমবে। ফলে দাম কমে OA থেকে OP-তে আসবে। যেখানে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। আবার দাম যদি OC হয় তাহলে যোগানের পরিমাণ OE এবং চাহিদার পরিমাণ OH। অর্থাৎ এখানে যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি ফলে দ্রব্যের দাম অবশ্যই বাড়বে এবং দাম OP-তে গিয়ে স্থির হবে। যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরম্পর সমান। এভাবে দেখা যায়, দাম যখন OP হয়, কেবল তখনই চাহিদা ও যোগানের মোট পরিমাণ সমান অর্থাৎ OM। অতএব OP দামে চাহিদা ও যোগান সমান থাকে এবং দাম বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। কাজেই OP হলো ভারসাম্য দাম এবং OM হলো ভারসাম্য পরিমাণ। R বিন্দুতে DD' এবং SS' রেখাদ্বয় পরম্পরকে ছেদ করে। অতএব এই R ছেদ বিন্দুতে নির্দেশিত হলো ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ।

কাজ: পোস্টার কাগজে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের চিত্রটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপযোগ কী?
২. ভোগ ও ভোক্তা বলতে কী বোঝায়?
৩. মোট উপযোগ ও প্রাণিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়?
৪. চাহিদার সংজ্ঞা দাও। চাহিদার বিধিটি কী?
৫. বাজার চাহিদা রেখা কী?
৬. যোগান বিধিটি কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ক্রমত্বাসমান প্রাণিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
২. একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।
৩. দুইজন ভোক্তার কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন কর।
৪. একটি কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন কর।
৫. চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

২. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি আবশ্যিক?

ক. যে বিন্দুতে চাহিদা = যোগান

খ. যে বিন্দুতে চাহিদা > যোগান

গ. যে বিন্দুতে যোগান > চাহিদা

ঘ. যোগান দাম < চাহিদা দাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহসীন স্কুলে গিয়ে পেয়ারা কিনে খেল। তার ভোগকৃত পেয়ারার উপযোগ সূচি নিচে দেওয়া হলো-

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	৫	৫
২	৯	৮
৩	১২	

৩. তাহসীনের ৩য় পেয়ারার প্রান্তিক উপযোগ কত?

ক. ৫ টাকা

খ. ৪ টাকা

গ. ৩ টাকা

ঘ. ২ টাকা

৪. তাহসীনের উত্তর আচরণে-

i. স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে

ii. পেয়ারার প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত রয়েছে

iii. পেয়ারার প্রতি প্রান্তিক উপযোগ ত্রুট্য করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ‘ক’ও‘খ’ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দামে ‘X’ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেওয়া হলো-

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	‘ক’ ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)	‘খ’ ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)
২০	৫	৭
১৫	১০	১১
১০	১৫	১৫

- ক. উপযোগ কাকে বলে?
- খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
- গ. ‘X’ দ্রব্যের চাহিদা সূচি থেকে ‘ক’ ব্যক্তির চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘X’ দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ক ব্যক্তির চাহিদা রেখার সাথে তুলনা কর।
২. সুজন বাজারে গিয়ে দেখে আলুর দাম প্রতি কেজি ২৫ টাকা। সে ১২০ কেজি আলু কিনে, কিন্তু করিম একই দামে ১৬০ কেজি আলু বিক্রি করতে চায়। পরদিন আলুর দাম কমে ২০ টাকা হওয়াতে সুজন ১৪০ কেজি আলু কেনে এবং তখন করিম ১৪০ কেজি আলু বিক্রি করে।
- ক. চাহিদা কাকে বলে?
- খ. চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. করিমের আলুর যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কী মনে কর সুজন ও করিম আলুর বাজারে ভারসাম্য দামে পৌঁছাতে পেরেছে? তোমার উন্নতির সপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন ও সংগঠন

Production & Organisation

শরবত একটি উৎপাদিত প্রুদ্য। শরবত উৎপাদন করতে পানি, চিনি, সেবু ইত্যাদির আমোজন হয়। উপকরণ ব্যবহার করে প্রুদ্য উৎপাদন এবং তা তোপের সাহায্যে উপযোগ বা ভৃত্তি সৃষ্টি করা যাব। উৎপাদন কাজটি করে থাকে সংগঠন। উৎপাদন করতে উপকরণ যেমন পানি, চিনি, সেবু লাগে, কীভাবে উৎপাদন করবে তা একটি পরিকল্পনা করতে হব। এবং উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজ করেন— মোশ্যুত্তা অনুযায়ী এই কাজগুলো বটেন করতে হব, উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন জন্য বাজারে নিতে হয়। এ ধরনের কাজগুলো করে সংগঠন। যে ব্যক্তি সংগঠনের মূল দায়িত্ব পালন করেন, তাকে বলা হব উদ্যোক্তা। সংগঠন বা উদ্যোক্তা দক্ষ না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হব না।



এই অধ্যায়ের পাঠ্যনথের আয়ো-

- উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- উৎপাদনের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারব;
- গড় ও ধাতিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব;
- ধৰ্মকাণ্ড ব্যয় ও অধৰ্মকাণ্ড ব্যয় চিহ্নিত করতে পারব;
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্শ্বক্য নির্ণয় করতে পারব;
- উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ প্রস্তুত আয়োজন হব এবং
- ক্রমচালনার আওতিক উৎপাদন বিধিটি সারণি ও সেখচিত্রের সাহায্যে উপর্যুক্ত করতে পারব।

৪.১ উৎপাদন ও উৎপাদক (Production and Producer)

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন-আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি থেকে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃণি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ নতুন দ্রব্য রুটির বিনিময় মূল্য আছে। ব্যবসা করার জন্য রুটি বানানো হলে অনেক সময় রুটিগুলো বাজারে নিয়ে যেতে হয়। উপকরণ সংগ্রহ থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজ তদারকি করে সংগঠন বা সংগঠন পরিচালক উদ্যোগ। যেমন কী উপকরণ লাগবে, কোথা থেকে উপকরণ আনবে, কে আনবে, কে লবণ, আটা, পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করবে, কে রুটি বেলবে, কে সেঁকবে, কে বাজারে নিবে, কত দামে বিক্রয় করবে, এই সবই দেখে সংগঠন বা সংগঠন পরিচালক উদ্যোগ। সব কিছু সংগঠন দক্ষতার সঙ্গে তদারকি না করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে না। একই ব্যক্তি সংগঠক এবং উৎপাদক হতে পারে। যেমন : যে ছেট/মাঝারি কৃষক নিজে নিজের জমিতে ফসল উৎপাদন করছেন, তিনি একই সাথে উৎপাদক এবং সংগঠক। কিন্তু যে কারখানার মালিক ম্যানেজার হিসেবে শ্রমিকদের দ্বারা কারখানা চালাচ্ছেন তিনি সংগঠক হলেও উৎপাদক নন। আবার যে কারখানার মালিক ম্যানেজার রেখে শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করাচ্ছেন তিনি সংগঠকও নন, উৎপাদকও নন তিনি নিছক মালিক। আবার যে মালিক নিজে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করছেন এবং অন্য উৎপাদকদের তত্ত্বাবধান করছেন, তিনি হচ্ছেন একই সঙ্গে মালিক-উৎপাদক-সংগঠক।

উৎপাদনে উপযোগ সৃষ্টি পাঁচ ভাগে দেখানো যায়। যেমন-

- ১. রূপগত উপযোগ :** দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উপযোগ বলে। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উৎপাদন।
- ২. স্থানগত উপযোগ :** কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন, বনের কাঠ সাধারণত বনের আশপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে- ফলে এর উপযোগ বাড়ে। আবার বনে ফুলের তেমন কদর নেই। কিন্তু সেই ফুলসহ গাছ শহরের বাড়ির আঙিনায় রাখলে এর কদর বাড়ে অর্থাৎ উপযোগ বাড়ে।
- ৩. সময়গত উপযোগ :** কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাঢ়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি না পেলেও তার উপযোগ বা দাম বর্ধিত হবে।

- ৪. সেবাগত উপযোগ :** মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাঙ্কার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে বা বৃদ্ধি করে।
- ৫. মালিকানাগত উপযোগ :** কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন, অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে আরো ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাঢ়াতে পারে।

উপরে তোমরা উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টির ধারণা পেলে। এবার তোমরা জানতে পারবে এই উৎপাদনের কাজটি কে বা কারা করে। রমজান আলী একজন কৃষক। তাঁর তিন বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে রমজান নিজেই এক খাতুতে ধান উৎপাদন করেন, অন্য খাতুতে গম উৎপাদন করেন। ধান ও গম উৎপাদনের মাঝখানে সবজি চাষ করেন। এই সব উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসাবে বীজ, সার, পানি, কাটনাশক, ধান-গম কাটা ও মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই সব কাজে পরিবারের লোকেরাও তাকে সহযোগিতা করে।

কাজ : (১) নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট উপযোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর।

(ক) মাছের পুকুর, (খ) সৈনিকের কাজ, (গ) পিতামাতার আদর-মেহ, (ঘ) বাবার সম্পত্তি সম্ভানকে প্রদান (ঙ) লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, (চ) গম থেকে আটা, (ছ) আখ থেকে চিনি, (জ) ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, (ঘ) গ্রামের কলা, ফলমূল, সবজি শহরে আনা (ঞ) অঞ্চল মাসের আলু আশাচঢ় মাসে বিক্রি ইত্যাদি।

কাজ : (২) রমজান আলী একজন মালিক, উৎপাদক না সংগঠক তা উল্লেখ কর।

৪.২ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

মনে কর তোমার এলাকায় গম, আলু, কলা, ধান, ইত্যাদি কৃষিপণ্য এবং কাপড়, বিস্কুট, প্লাস্টিক ইত্যাদি শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয়। এই কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অনেকগুলো উপকরণের প্রয়োজন হয়। কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, লাঙ্গল, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিল্ডিং, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তৈল, শ্রমিক লাগে। এসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, মাটির উর্বরতা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খনিজ দ্রব্য, সূর্য কিরণ, পানি, আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো, এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ। অতএব কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে।

উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের হয়। যেমন: ১. ভূমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মূলধন (Capital), এবং ৪. সংগঠন (Organisation)

১. **ভূমি** : উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। যেমন, জমি, মাটি, মাটির উর্বরতা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।
২. **শ্রম** : উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষি, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস- আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাঙ্কারের সেবা ও উকিলের পরামর্শ এক ধরনের শ্রম।
৩. **মূলধন** : মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ তোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।
৪. **সংগঠন** : সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন, তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন, কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা-এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার উন্নত শিল্পপ্রধান দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

কাজ : (১) দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে?

দেশের নাম	উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ
জাপান শিল্পনির্ভর দেশ

কাজ : (২) উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও।

উৎপাদন খাত	অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হচ্ছে
কৃষি
শিল্প

৪.৩ সংগঠন ও এর বিকাশ (Organisation and Its Development)

আয়েশা বেগম তাঁর সৎসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার থেকে সারা বছরই কমবেশি ডিম উৎপাদিত হয়। এক বছর পর সরকারি মাছের খামার দেখতে যান আয়েশা এবং এর পর থেকে তাঁর মাথায় হাঁস-মুরগির খামারের পাশাপাশি মাছ চাষ করার আগ্রহ জাগে। এক বছরে হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রির নিট আয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে পুকুর করে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ শুরু করেন। দুটি খামারে নতুন করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ দেন। হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রি এবং এক বছর পরে পুকুরের মাছ বিক্রি শুরু হলে আয়েশার উপার্জন বাঢ়তে থাকে। তিনজন সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং সৎসারের অন্যান্য যাবতীয় খরচ মিটিয়ে আয়েশার সম্মত বাঢ়তে থাকে। আয়েশার মাছ ও হাঁস-মুরগির খামারের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর স্বামী রহমত আলী শহরের চাকরি ত্যাগ করে গ্রামে স্ত্রীর খামারে যোগ দেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেশ কিছু জমি, হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। ১২ জন নারী-পুরুষ শ্রমিকও নিয়োগ করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বুর্কিয়ে দেন তাঁরা। আয়েশা এবং রহমত পালাত্বমে শ্রমিক কর্মচারী এবং খামারসমূহ তদারক করেন। ডিম ও মাছ বাজারজাত করে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। তাদের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকে তাঁদের অনুসরণ করে গ্রাম ও এলাকা জুড়ে হাঁস-মুরগির খামার এবং মাছ চাষ শুরু করেন। ডিম ও মাছ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকার নিয়মিত আসে আয়েশার গ্রাম। কয়েক বছরে এলাকাটি কৃষি, হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষাবাদ করে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

আমরা কি বলতে পারি যে আয়েশা বেগম একজন সংগঠক? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা কি বিকাশ লাভ করেছে? উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমূখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে সংগঠন বলে। সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যবলি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কার্য সম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, নিয়ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল। সংগঠনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সম্মিলিত উৎপাদন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎপাদনের বা আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। তা না হলে কোনো সামাজিক সংগঠনই টেকসই হয় না।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে তা হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর যে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠনের চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে। সুতরাং সংগঠনই হলো ব্যবসায়ের বা যে কোন সামাজিক উৎপাদনের মৌলিক ও প্রধান বিষয়।

একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হচ্ছে-

- ১. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গোণ, কোনটি স্বল্পমেয়াদি এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তা নির্ধারণ করে নিতে হয়।
- ২. ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি। সে জন্য প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পণ্য মজুদ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- ৩. কার্যাবলির বিভাগ :** কার্যাবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজগুলোকে আবার উপবিভাগে ভাগ

করা হয়। যেমন, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। অনেক সময় কোনো কোনো ব্যবসা আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়। কয়েকটি শাখা একত্রে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হয়।

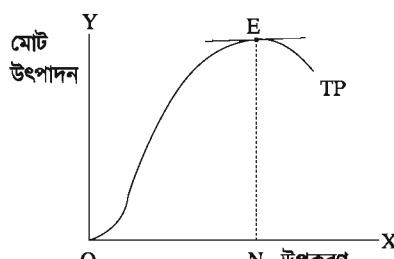
৪. কর্তব্য বর্ণন : ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগে ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ, তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।
৫. অধিকার ও ভার বর্ণন : ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিশেষ এবং যথাযথভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার একাংশ তাঁর অধস্তন কর্মীকে অর্পণ করেন। আবার অধস্তন কর্মী তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন। উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে এই দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সফল হয়।

কাজ : সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

৪.৪ মোট, গড় ও প্রাণ্তিক উৎপাদন (Total, Average and Marginal Production)

কমল বাবু তাঁর এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করেন। এখানে গড়ে শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। শ্রমিক প্রতি এই ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে গড় উৎপাদন বলে। পরের মৌসুমে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এখানে গত বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫ কুইন্টাল। এই $655 - 600 = 55$ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে প্রাণ্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত একজন (১১তম) শ্রমিক নিয়োগ করায় উৎপাদন বাঢ়ল ৫৫ কুইন্টাল। ১১তম শ্রমিক হলো প্রাণ্তিক শ্রমিক। সুতরাং প্রাণ্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হলো ৫৫ কুইন্টাল। তাহলে এখানে ৬০০ কুইন্টাল হচ্ছে ১০ জন শ্রমিকদের মোট উৎপাদন, ৬০ কুইন্টাল হচ্ছে শ্রমিকপ্রতি গড় উৎপাদন এবং ৫৫ কুইন্টাল হচ্ছে ১১তম শ্রমিকের প্রাণ্তিক উৎপাদন। মোট, গড় এবং প্রাণ্তিক উৎপাদনকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো।

মোট উৎপাদন : বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে।



চিত্র: মোট উৎপাদন রেখা

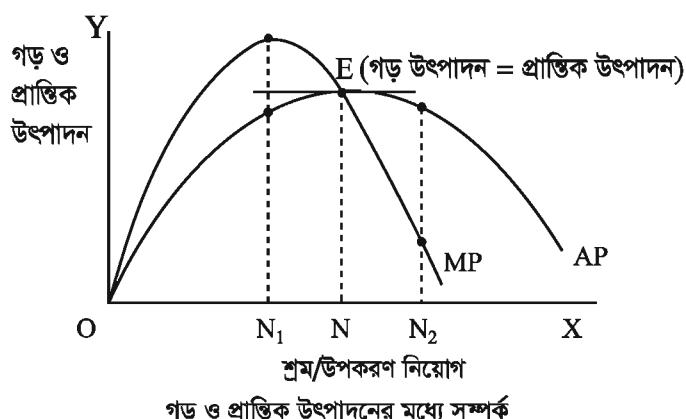
চিত্রে TP (Total Production) রেখা দ্বারা মোট উৎপাদন বোঝানো হয়েছে। মাত্র একটি উপকরণ ON পরিমাণ নিয়োগ করে E বিন্দুতে সর্বোচ্চ NE পরিমাণ মোট উৎপাদন হয়। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে উৎপাদনের অন্য উপকরণগুলো স্থির (Fixed) রয়েছে।

গড় উৎপাদন : মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে উপকরণ হিসেবে শ্রমকে নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

প্রাণ্তিক উৎপাদন : এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রাণ্তিক উৎপাদন বলে। শ্রম ব্যবহার করলে শ্রমের বা মূলধন ব্যবহার করলে মূলধনের প্রাণ্তিক উৎপাদন বলব। অর্থাৎ এক একক মূলধন বা এক একক শ্রম বা একজন শ্রমিক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রাণ্তিক উৎপাদন বলে। ৫১ নং পৃষ্ঠার সূচি থেকে দেখা যায় শ্রম উপকরণ ১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ২২ কুইন্টাল হয়। এখানে প্রাণ্তিক উৎপাদন হচ্ছে $(22-10) = 12$ কুইন্টাল। একইভাবে উপকরণ নিয়োগ ৩ তে বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ কুইন্টাল। এখানে প্রাণ্তিক উৎপাদন হলো $(30-22) = 8$ কুইন্টাল।

গড় ও প্রাণ্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক : উৎপাদন-ব্যবস্থায় গড় উৎপাদন ও প্রাণ্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। চিত্রে AP হচ্ছে গড় উৎপাদন রেখা এবং MP হচ্ছে প্রাণ্তিক উৎপাদন রেখা। চিত্রে দেখা যাচ্ছে –



- প্রাণ্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রাণ্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এ জন্য প্রাণ্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে ON₁ উপকরণ নিয়োগ স্তরে প্রাণ্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

২. প্রাণিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে এবং কমতে থাকে, তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এ অবস্থায় কিছুদূর পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা প্রাণিক উৎপাদন রেখার নিচে থাকে এবং বাড়তে থাকে। চিত্রে ON_2 উপকরণ নিয়োগ স্তরে গড় উৎপাদন, প্রাণিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হলেও তা কমছে। ON পর্যায়ে এসে আমরা দেখছি যে প্রাণিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন পরস্পর সমান হয়েছে। এরপর থেকে গড় উৎপাদন ও প্রাণিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রাণিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম থাকে।
৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রাণিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রাণিক উৎপাদন সমান হয়। চিত্রে ON উপকরণ নিয়োগ স্তরে E বিন্দুতে গড় ও প্রাণিক উৎপাদন সমান।

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম অথবা উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) শ্রম বা উপকরণের গড় ও প্রাণিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ON পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের পূর্বে ON_1 , উপকরণ নিয়োগ স্তরে MP , AP উভয়ই বৃদ্ধি পায়, তবে MP বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থাকে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান স্তর বলে। এরপর ON উপকরণ নিয়োগ স্তরে AP সর্বোচ্চ হয় এবং AP ও MP সমান হয়। এই সংক্ষিপ্ত স্তরে প্রাণিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি কিন্তু ক্রমহ্রাসমান অন্যদিকে এই স্তরে গড় উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এবং সর্বোচ্চ মাত্রার দিকে ধাবিত হয়। আবার ON উপকরণ নিয়োগের পর যেমন ON_2 উপকরণ নিয়োগ স্তরে AP , MP উভয় কমতে থাকে, তবে AP -এর চেয়ে MP বেশি হারে কমে। অতএব গড় উৎপাদন ও প্রাণিক উৎপাদনের মধ্যে তিনি ধরনের সম্পর্ক হচ্ছে প্রাণিক উৎপাদন প্রথম পর্যায়ে গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি (ON পর্যন্ত), তারপর প্রাণিক উৎপাদন ON উপকরণ নিয়োগ স্তরে এসে গড় উৎপাদনের সমান হয় এবং পরবর্তী সময়ে প্রাণিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম হয় (NN_2 পর্যন্ত)।

৪.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরো বাঢ়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রাণিক উৎপাদন ক্রমশ কমে।

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে। মনে করি আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রাণিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রাণিক শ্রমের

জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। একারণে প্রাণিক শ্রমের বৃদ্ধির ফলে প্রাণিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়নোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে থাকলে একটি পর্যায়ে এসে ভূমির তুলনায় শ্রম অনেক বেশি হওয়ায় শ্রমের প্রাণিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধি। নিম্নের সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।

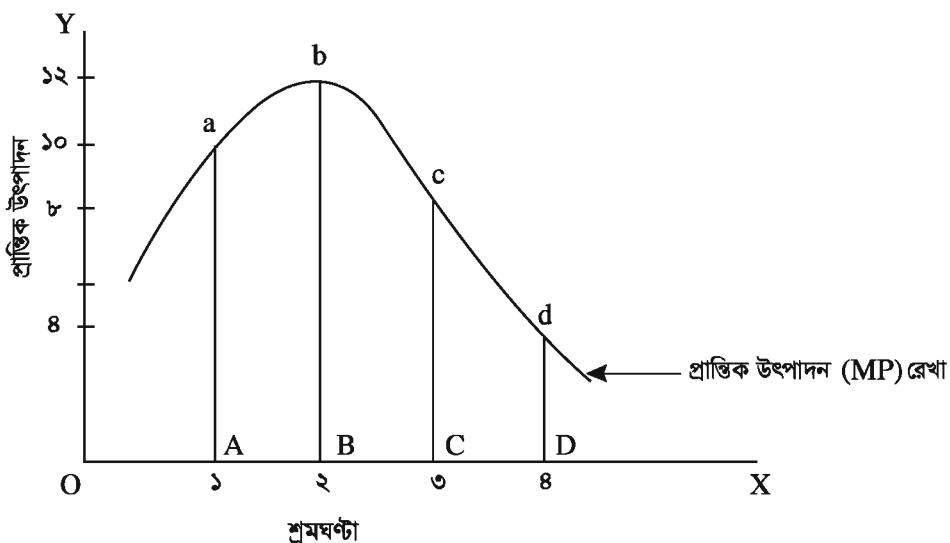
সূচির মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধি

ভূমি (ভূমির পরিমাণ স্থির)	শ্রম উপকরণ (শ্রমিকের শ্রমঘন্টা)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রাণিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১	A	১০	১০
১ "	২	B	২২	১২
১ "	৩	C	৩০	৮
১ "	৪	D	৩৪	৪

[শ্রমঘন্টা = ১, ২, ৩, ৪। একজন শ্রমিকের এক ঘন্টার কাজকে এক শ্রম ঘন্টা বলে।]

উপরের সূচি থেকে দেখা যায়, ১ হেক্টর জমিতে শ্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রাণিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান থাকে। পরবর্তীতে তা ক্রমশ: হ্রাস পায়। সংমিশ্রণ A অনুযায়ী ১ হেক্টর জমিতে ১ শ্রমঘন্টা ব্যয় করে মোট ও প্রাণিক উৎপাদন হয় ১০ কুইন্টাল। B সংমিশ্রণ অনুযায়ী শ্রমঘন্টা ২ এ বাড়লে মোট উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রাণিক উৎপাদন ($22-10$) = ১২ কুইন্টাল হয়। এখানে উপকরণ ১ শ্রমঘন্টা থেকে ২ শ্রমঘন্টায় উন্নীত করলেও প্রাণিক উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ২ কুইন্টাল বেশি। প্রথম পর্যায়ের এই উৎপাদনকে ক্রমবর্ধমান প্রাণিক উৎপাদন বলে। একই ভাবে C সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে এক শ্রমঘন্টা (উপকরণ) বাড়নোর ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রাণিক উৎপাদন ১২ কুইন্টাল থেকে ৮ কুইন্টালে নেমে আসে। অর্থাৎ প্রাণিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়। উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাণিক উৎপাদন কম হওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধি বলে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহাসমান প্রাণ্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা হলো :



ক্রমহাসমান প্রাণ্তিক উৎপাদন বিধি

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমঘণ্টা এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রাণ্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে শ্রমঘণ্টার ধাপসমূহ হচ্ছে ১, ২, ৩, ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণ্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হলো Aa(১০), Bb(১২), Cc(৮), Dd(৮) কুইন্টাল।

এখন প্রাণ্তিক উৎপাদন সূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করলে প্রাণ্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ক্রমহাসমান প্রাণ্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

৪.৬ উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

রাজশাহীর নূরু মিয়া ২ একর জমিতে লিচু বাগান করেছেন। বাগানে প্রায় ১০০টি লিচু গাছ আছে। এ বছর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বাবদ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। লিচুর ফলনও ভালো হয়। নূরু মিয়া ও তার ছেলে ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে বাদুড় ও অন্যান্য পাথির উপদ্রব থেকে বাগানকে রক্ষা করেন। এই লিচু বাগানের জন্য দুধরনের খরচ হয়। ১. উপকরণ বাবদ ব্যয় অর্থাৎ আর্থিক উৎপাদন ব্যয় এবং ২. ঘুম ও আরাম ত্যাগ অর্থাৎ মানবিক কষ্ট। প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় পরিমাপ করতে হলে এই দুই ধরনের ব্যয়কেই বিবেচনায় নিতে হবে। এদের সমষ্টিকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

৪.৭ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় (Explicit and Implicit Cost)

কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ বা শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন, এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের স্থির ব্যয় যেমন, বাড়ি ভাড়া, মূলধনের সুদ ইত্যাদি।

অপ্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো, ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

৪.৮ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় (Personal and Social Cost)

উপরে আমরা আর্থিক উৎপাদন ব্যয়, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় সম্পর্কে জানবো।

কোন ফার্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্পদ বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অপ্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এক কথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তির সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফল হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যয়। উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

যেমন, শহর এলাকায় বসবাসরat লোকদের মটরগাড়ির ধোঁয়া শহরের লোকদের শারীরিক ক্ষতি করে। এ জন্য সমাজকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে সামাজিক ব্যয় বলে। সামাজিক ব্যয়ে ব্যক্তিগত ব্যয় প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত ব্যয়ে সামাজিক ব্যয় প্রতিফলিত না-ও হতে পারে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের সঙ্গে ওত্থোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও তা সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাবে অঙ্গৰ্ভে হয় না।

কাজ : একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ? দলগতভাবে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপকরণ বলতে কী বোঝায়?
২. কৃষি উৎপাদনে কয়েকটি উপকরণের নাম লিখ।
৩. সংগঠকের ধারণা দাও।
৪. প্রাণিক উৎপাদন ক্রমজ্ঞাসমান হয় কেন?
৫. ক্রমজ্ঞাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধির মূল কথাটি কী?
৬. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় কী? উদাহরণসহ ধারণা দাও।
৭. সামাজিক ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের পার্থক্য একটি উদাহরণ দিয়ে বুবিয়ে দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

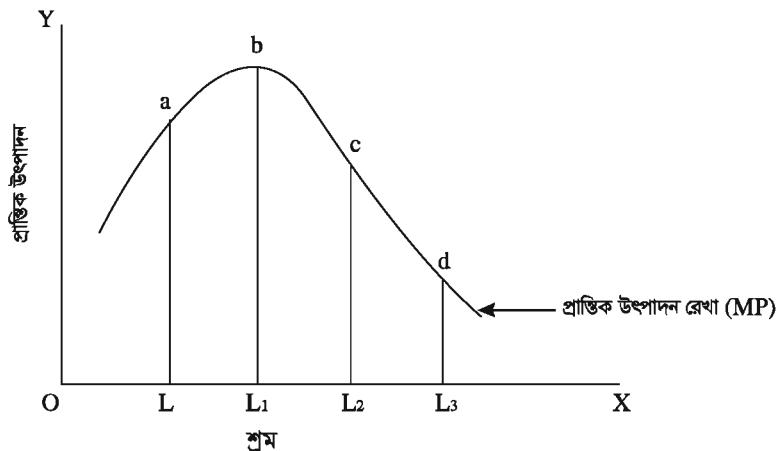
১. উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির পাঁচটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
২. উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৩. সংগঠনের বিকাশ কীভাবে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. মোট, গড় ও প্রাণিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৬. ক্রমজ্ঞাসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

ক. ২টি	খ. ৩টি
গ. ৪টি	ঘ. ৫টি
২. কোন ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইতে থাকে না?

ক. স্থির ব্যয়	খ. মোট ব্যয়
গ. প্রকাশ্য ব্যয়	ঘ. অপ্রকাশ্য ব্যয়



উপরের চিত্রটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ନିଚେର କୋଣଟି ସାରିକ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. কবির একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে। তিনি ৩০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তাঁর আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

ক. শ্রম কাকে বলে?

খ. ক্রমত্বান্বয়ে উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়?

গ. কবিরের উপযোগ সূষ্ঠির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিরকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. হোসেন আলী প্রথম বছর তাঁর নিজের এক একর জমিতে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রম নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

শ্রমিকের সংখ্যা	ধানের মোট উৎপাদন (কেজি)	ধানের মোট উৎপাদন মূল্য (প্রতি কেজি ২০ টাকা)	প্রাণ্তিক উৎপাদনের মূল্য
১	৫০	১০০০	১০০০
২	১০০	-	-
৩	১৩০	-	-
৪	১৫০	-	-

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

খ. ব্যক্তিগত ব্যয় বলতে কী বুঝায়?

গ. উপরের সারণিটি পূরণ কর।

ঘ. সারণিতে উপস্থাপিত বিষয়টি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও প্রযোজ্য- মতামত দাও।

**পার্ক অধ্যার
বাজার
Market**

অধ্যনীভিত্তে বাজার ধারণাটি একটি পথের চাহিদা, ঘোগান ও দাম নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বাজার ধারণাকে সময় যোগাদ, পরিধি, স্থানের প্রকৃতি এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বাজার রয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাজারে জেন্ডা ও বিক্রেতার মধ্যে চিন্তাবন্ধন ও আচরণের পরিবর্তন দেখা যায়।



এই অধ্যার পাঠশিল্পে আসছা-

- বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাজার বিকাশের ধারা ও অকারণের বর্ণনা করতে পারব;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে ফুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে বাজারবচন্ত্বার ধরন চিহ্নিত করতে পারব;
- দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উপসাহিত হব এবং
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অঙ্কন করে দেখাতে পারব।

৫. বাজার (Market)

সুবেদ আলী একজন চাকরিজীবী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য নিউ মার্কেট গেলেন। মাছ, তরিতরকারি, চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জিনিসের দাম যাচাই করে কিনলেন। বিক্রেতারা নগদ টাকার বিনিময়ে সুবেদ আলীর কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলেন। শ্রাবণী অনলাইনে একটি পোশাক ক্রয়ের অর্ডার দেয়। যথাসময়ে পোশাকটি পেয়ে দাম পরিশোধ করে। ওপরের ঘটনা দুটিতে একটি পণ্যকে ঘিরে ক্রেতা ও বিক্রেতার যে সংযোগ ঘটে, তাকেই বাজার বলে।

অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়। যেমন অনলাইনে বেচা-কেনা, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে বেচা-কেনা। এ ধরনের বাজারে বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা বা বিশেষায়িত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সিমেন্ট কেনা-বেচা ইত্যাদি।

দ্রব্যের ধরন অনুযায়ী বাজার ভিন্ন হতে পারে। যেমন, পাটের বাজার, চালের বাজার, শ্রমের বাজার, চায়ের বাজার, স্বর্ণের বাজার, শেয়ারবাজার ইত্যাদি। আবার সময় মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের বাজার, অল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ সময়ের বাজার রয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকশাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই নিয়মকে দামের নিয়ম বলে। এ দামের উপর দ্রব্যের বেচা-কেনা নির্ভর করে। দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা করে। চাহিদা ও যোগান শক্তি দাম নির্ধারণ করে।

ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুর্নটের মতে, “অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝাননি। বরং যেকোনো অঞ্চলের সম্প্রতিকে বোঝায়, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম সহজে ও দ্রুতভাবে সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।” উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোকানে চাল বিক্রি হচ্ছে – কিন্তু পরিবহন খরচের তারতম্যটুকু বাদ দিলে মোটামুটি একই দামেই তা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এই হিসাবে এটি চালের বাজার হিসাবে গণ্য হতে পারে।

কাজ : বাজারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

৫.১ বাজারের বিকাশ ও প্রকারভেদ (Development and Types of Markets)

বাজারের ধারণায় যে মৌলিক বিষয়গুলো কাজ করে তা হলো চাহিদা, যোগান, সময় এবং দাম।

বাজারব্যবস্থায় একটি সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা দর-কষাকষি করে দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ করে বেচা-কেনা করে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে এবং বাজার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের উৎপত্তি বিভিন্ন ধরনের হয়েছে

- অতি স্বল্পকালীন বাজার :** যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। কারণ ঐ অতি অল্পসময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ফলে চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।
- স্বল্পকালীন বাজার :** চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান খানিকটা সাড়া দিতে সক্ষম। এই বাজারে ফার্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফার্ম উৎপাদন কমাতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।
- দীর্ঘকালীন বাজার :** চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন এবং উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তন করে উৎপাদন এবং যোগানের সাথে সমন্বয় করে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।

অঞ্চলভেদে বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়

- **স্থানীয় বাজার:** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে সে দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। যেমন: মাংসের বাজার।

- **জাতীয় বাজার :** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সেই দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন, মোটা চালের বাজার।
- **আন্তর্জাতিক বাজার :** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশের ভূখণ্ডে বাইরেও বিস্তৃত থাকে, সেই দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন- তৈরি পোশাক।

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণি বিভাগ

আগের অনুচ্ছেদে সময় অনুসারে বাজারের ধরন এবং স্থান বা আয়তন অনুসারে বাজারের ধরন সম্পর্কে আমরা পরিচিত হয়েছি। এখন সমগ্র বাজার কাঠামোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আলোচনা করব। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের বিশ্লেষণই অর্থনীতির জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরনসমূহ হচ্ছে : ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রধানত তিনি প্রকার। ক. একচেটিয়া বাজার খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক গ. অলিগোপলি বাজার বাজার।

নিচে অতি সংক্ষেপে এ ধরনের কয়েকটি বাজারের ধারণা দেওয়া হলো।

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং একজন বা অল্প কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যের বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একবার দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে ব্যক্তিগতভাবে তা মেনে নিতে হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. **অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্যের অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।
২. **দ্রব্যের একক সমজাতীয় :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই শুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। যেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায়, তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। যেমন- মোটা চাল, মসুরের ডাল।

৩. ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সমক্ষে পূর্ণ জ্ঞাত : বাজারব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হলে পণ্যের এককের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে সকল ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি অবহিত থাকে ।
৪. শিল্পে ফার্মসমূহের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের অধীনে শিল্পে ফার্ম দীর্ঘকালীন সময়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে শিল্প ত্যাগ করতে পারে । এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধানিষেধ থাকে না ।
৫. বাহ্যিক প্রভাব নেই : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না । মোট কথা হচ্ছে, কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার প্রভাব সৃষ্টি করে না ।
৬. উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে । শ্রম উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণ বিচরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধানিষেধ থাকে না । বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণের গতিশীলতা থাকায় উপকরণ দাম সর্বত্র সমান থাকে ।
৭. নির্দিষ্ট দামে উৎপাদনকারী মূলাফা সর্বোচ্চকরণের প্রচেষ্টা নেয় : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মূল লক্ষ্য থাকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মূলাফা অর্জন । প্রদত্ত দামে ফার্ম মূলাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘমেয়াদে শিল্প স্বাভাবিক মূলাফা অর্জন করে । মনে রাখা দরকার যে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে তাকে স্বাভাবিক মূলাফা বলে । এখানে ব্যয়ের মধ্যে উদ্যোক্তার পরিশ্রম এবং আয়ের মধ্যে উদ্যোক্তার পারিশ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে হিসাব করা হয়েছে ।

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রকারভেদ

ক) একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

মনো (Mono) অর্থ এক, পলি (Poly) অর্থ বিক্রেতা । ফলে মনোপলি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একজন মাত্র বিক্রেতা । মনোপলি কথাটির অভিধানগত অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি, সরকার অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার । অতএব, যখন কোনো একটি মাত্র ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়, তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয়, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয় । যে দ্রব্য বিক্রয়ে যে ফার্ম একচেটিয়া অধিকার লাভ করে, সেই ফার্ম বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে । এই ফার্মটি ছাড়া আর অন্য কোনো ফার্ম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে পারে না বলে একচেটিয়া বাজারে ফার্ম শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না । পুরোপুরি একচেটিয়া বাজার বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন । তবে প্রায় একচেটিয়া বাজারের বেশ কয়টি উদাহরণ দেওয়া যায় । যেমন, বাংলাদেশ অঙ্গিজেন, জয়দেবপুরে অবস্থিত সমরাত্ম কারখানা ইত্যাদি ।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopoly Market)

একচেটিয়া বাজার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায় ।

১. বিক্রেতা উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে : একচেটিয়া বাজারে একজনমাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা থাকে । তাই বিক্রেতা বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ।
২. নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই : একচেটিয়া ফার্ম যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রি করে, সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই । অর্থাৎ দ্রব্যটির সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না ।
৩. সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা : একচেটিয়া কারবারি যদি ব্যক্তি বা বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তার লক্ষ হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা ।
৪. একচেটিয়া কারবারির ফার্ম ও শিল্প একই : একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম থাকে । ফলে সে ফার্মটিই শিল্প হিসেবে পরিচিত ।
৫. এককভাবে দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রক : একচেটিয়া ফার্ম এককভাবে উৎপাদন যোগান দিয়ে থাকে । একমাত্র উৎপাদক হওয়ায় খুব সহজেই দ্রব্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । তবে ফার্মটি ইচ্ছামতো হয় দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে; একসঙ্গে দুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ।
৬. নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ : একচেটিয়া শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই । নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয় । সে ক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের ভয়ে প্রবেশ করে না । সে জন্যই একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না ।

কাজ : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা কর ।

খ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায় । একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ হলেও অভিন্ন নয় । অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে । আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান । আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয় । সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং

একচেটিয়া উৎপাদন সমষ্টিয়ে যে বাজার গড়ে উঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানির গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমন মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের মেকোনো একটির দাম বাড়লে, সাবানটির চাহিদা সামান্য কমতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ভঙ্গ ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

- ফার্ম/বিক্রেতার সংখ্যা :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অসংখ্য। এক একটি ফার্ম বাজারে মোট উৎপাদনের একটি সামান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে কোনো ফার্মের পক্ষেই পণ্যের মূল্য বা মোট উৎপাদনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এ জন্য অনেক সময় জোট বা দলভুক্ত ফার্ম থাকে।
- উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন ফার্ম যে সব পণ্য উৎপাদন করে, সেগুলো অনেকটা সদৃশ হলেও একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব। দ্রব্যগুলো গুণগত ও বাণিজ্যিক দিক থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সমজাতীয় নয়। এ জন্যই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।
- শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্পে ফার্মের প্রবেশ এবং প্রস্থানে ফার্মের কোনো বাধানিষেধ নেই। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা করলে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে। আবার কোনো ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প পরিত্যাগ করতে পারে। এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ বা বাণিজ্যিক কোনো বাধা নেই।
- বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ :** প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি প্রচার করে। বেশি প্রচারের ফলে এই ফার্মগুলোর বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক বিক্রয়জনিত ব্যয় বেড়ে যায়। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
- চাহিদার প্রকৃতি :** কোনো ফার্ম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে অনেক ভোক্তা অপর ফার্মের পরিবর্তক দ্রব্য ক্রয় করলেও এমন কিছু ভোক্তা থাকে, যারা প্রথম ফার্মের পণ্যই কম পরিমাণে হলেও ক্রয় করে। অর্থাৎ কোনো ফার্ম পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি করলেও সেই পণ্যের চাহিদা শূন্য হয় না। প্রতিটি ফার্মের

জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ পছন্দনীয়তা থাকে বলে প্রতিটি ফার্মের চাহিদা রেখার আকৃতি সাধারণত এক রকম হয় না। চাহিদা রেখার আকৃতি মূলত নির্ভর করে বিবেচনাধীন ফার্মের দ্রব্য অপরাপর ফার্মের দ্রব্যের সাথে কতটুকু পৃথক তার উপর।

৬. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।
৭. **দ্রব্যের অনুকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা অপর একজন বিক্রেতার উৎপাদিত দ্রব্য পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে না। ফলে প্রত্যেক বিক্রেতা বা ফার্ম একচেটিয়া ফার্মের মতো নিজ নিজ দ্রব্যের যোগান বা যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৮. **দীর্ঘকালীন পরিস্থিতি :** দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্মের মতো স্বাভাবিক মুনাফা হয়ে থাকে।

গ) অলিগোপলি বাজার

অলিগোপলি এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ত্রয়-বিক্রয় করেন, এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেমন, “টেলিযোগাযোগ খাতের” ফার্ম তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে একজন চলচিত্রের নায়ককে ব্যবহার করলেন। সেটা পর্যবেক্ষণ করে আরেকটি ফার্ম তার বিজ্ঞাপনে একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়কে ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Oligopoly Market)

১. **বিক্রেতার সংখ্যা :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে কতিপয় বিক্রেতা থাকে।
২. **দ্রব্যের প্রকৃতি :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজার সমজাতীয় অর্থাৎ দ্রব্যটি একই ধরনের বা প্রায় সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকরণ করা যায়।
৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারের একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৪. **বিজ্ঞাপনের প্রভাব :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে ফার্মসমূহ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কাজ : প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি কর।



৫.২ বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা (Market System of Bangladesh)

এ অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাজার এবং বেচা-কেনার ধরন লক্ষ করা যায়। বাস্তব উদাহরণ ধারা এই তিনি ধরনের বাজার নিয়ে আলোচনা করা যায়।

১. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার:** বাংলাদেশে কোনো পণ্যের বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নেই, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কাছাকাছি বাজার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার এ বাজারের ভালো উদাহরণ। যেমন, ধানের প্রাথমিক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং কোনো একজন উৎপাদক ধানের বাজারকে প্রভাবিত করতে পারেনা। এভাবে অন্যান্য খাদ্যশস্য, মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ প্রভৃতির বাজারও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা তার কাছাকাছি। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে এ বাজার দেখা যায়। যেমন- রিকশা পরিবহন।

২. একচেটিয়া বাজার : বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। তবে আমদানিকৃত পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। ঢাকা শহরে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার বিদ্যমান। রেলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একক প্রতিষ্ঠান।
৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার : বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্যের বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক। যেমন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী দ্রব্য। কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

কাজ: নিম্নলিখিত পণ্যগুলো স্থানভেদে কোন ধরনের বাজার তা উল্লেখ করে যুক্তি দাও।

পণ্যের নাম	বাজারের নাম ও যুক্তি
ক. আম
খ. কাঠাল
গ. তরিতরকারি
ঘ. মাছ
ঙ. তাঁত কাপড়
চ. চা
ছ. পেয়ারা, কলা, বরই
জ. নারিকেল
ঝ. গো-দুধ
ঞ. মাংস

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজার বলতে কী বোঝায়?
২. মূল্যের নিয়ম কী?
৩. বাজারব্যবস্থায় তিনটি মৌলিক বিষয় কী কী?
৪. সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার কত ধরনের হয় এবং কী কী?
৫. স্থানভেদে বাজার কয় ধরনের হয় এবং কী কী?
৬. ফার্ম ও শিল্পের ধারণা দাও।
৭. উপকরণ বাজার কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সময় মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।
২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. তোমার বইয়ে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কাঠামোর একটি ছক তৈরি কর।
বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের বাজারব্যবস্থার পরিচিতি দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘পণ্যের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি জানে’ বৈশিষ্ট্যটি কোন বাজারের?
 - ক. একচেটিয়া
 - খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
 - গ. অলিগোপলি
 - ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক
২. দামের নিয়মে বেচাকেনা হলো-
 - i. ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
 - ii. চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
 - iii. নির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও:

সিদ্ধিক সাহেব রাস্তার পাশের বাজার থেকে ছোট মাছ, মুরগি নিয়ে চট্টার সময় বাসায় আসেন, মিসেস সিদ্ধিক সবজি আনতে বললে তিনি বলেন, এখন তো আর পাওয়া যাবে না।

৩. জনাব সিদ্ধিক কোন ধরনের বাজার থেকে মাছ, মুরগি ক্রয় করেন?

- | | |
|--------------------|----------------|
| ক. অতি স্বল্পকালীন | খ. দীর্ঘকালীন |
| গ. অতি দীর্ঘকালীন | ঘ. স্বল্পকালীন |

৪. উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো-

- i. দ্রব্যের কেনা বেচার জন্য অনেক লোকের আগমন
- ii. বিক্রিত দ্রব্যগুলোর গুণাগুণ ও গঠন প্রকৃতি একই ধরনের।
- iii. একই ব্যক্তি বাজারের দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. কামাল : আমাকে একটি ম্যাটাডর কলম দিন।

দোকানদার : ভাইয়া, এ সঙ্গে ইকোনো কলমের দাম কমেছে, মেবেন কি?

কামাল : কেন ম্যাটাডর থেকে ইকোনো কলম কি মানে- গুণে আলাদা?

দোকানদার : না তেমন নয়। বাজারে অনেক কোম্পানি আছে তাদের সবার কলম প্রায় একই মানের কেবল দেখতে সামান্য ভিন্ন।

কামাল : তাহলে আমাকে ম্যাটাউরই দিন। এটিই আমার ভালো লাগে।

ক. ফার্ম কাকে বলে?

খ. স্বল্পকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কামালের ক্রয়কৃত দ্রব্যটি কোন বাজারের পণ্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে কামালের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. রিমি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ব্যাগ ব্যবহার করে। সে নতুন একটি ব্যাগ বাজারে কিনতে গেলে দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানি জানায় যে উক্ত ব্যাগ একটি মাত্র কোম্পানি আমদানি করে। কোম্পানি দাম বাড়ালে তাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ কোনো ব্যাগ বাজারে না থাকায় রিমিকে উচ্চ দরে ব্যাগটি ক্রয় করতে হয়।

ক. উপকরণ কাকে বলে?

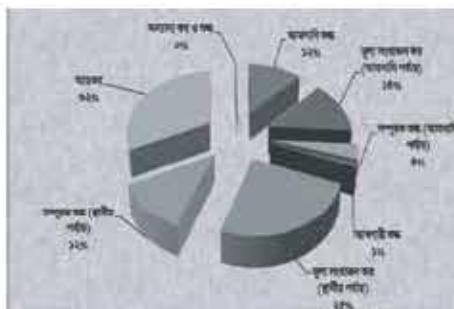
খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

গ. রিমির ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশে রিমির ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের পরিধি কতটুকু? বিশ্লেষণ কর।

বর্ষ অধ্যায়

একটি দেশের জাতীয় আহরণ ধারণা থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যোৰা যায়। অর্থাৎ দেশটি কী উন্নত, উন্নয়নশীল, না অনুন্নত এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আহরণ কর্তৃ, তা জানার জন্য জাতীয় আহরণ পরিমাপ করতে হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় আহরণ পরিমাপ পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।



এই অধ্যায় পাঁতশেবে আসো—

- জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
 - মোট জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) পর্যবেক্ষণ দেখাতে পারব;
 - মোট জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে নিট জাতীয় আয়ের (NNI) তুলনা করতে পারব;
 - জিডিপি (GDP) পরিযাপ্তের পর্যাপ্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
 - জিডিপির (GDP) নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই প্রেমিতে বিন্যস্ত করতে পারব;
 - জিডিপির (GDP) হিসাববিহুর্ণ বিষয়াদিসমূহ ভালভাবে প্রযুক্ত করতে পারব এবং
 - বাংলাদেশের জিডিপি (GDP) পরিযাপ্ত পর্যাপ্তি বর্ণনা করতে পারব।

৬.১ জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ (Concepts of National Income)

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

মনে করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। যেমন- ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০ জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = $100 \text{ কুইন্টাল ধান} \times \text{প্রতি কুইন্টাল ধানের বাজার দাম} + 1000 \text{ জামা} \times \text{প্রতি এককের জামার বাজার দাম} + 1000 \text{ কলম} \times \text{প্রতি এককের কলমের বাজার দাম}$ । এভাবে কোনো দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের পরিমাণকে নিজ নিজ দাম প্রতি এককের দ্বারা গুণ করে তার সমষ্টি বের করে জিডিপি নির্ণয় করা হয়। তবে ধান থেকে যদি চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে চাল তৈরি হয়, তাহলে আমাদেরকে হিসাবের সময় ধানের বদলে চাল উৎপাদন এবং চালের দামকে হিসাবে নিতে হবে।

মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়োর বিয়োগ ফলকে বোঝায়। এই পরিমাণটি খণ্ডাত্মক হলে মোট জাতীয় আয় মোট দেশজ আয়ের চেয়ে কম হবে। আর এটি যদি ধনাত্মক হয়, তাহলে মোট জাতীয় আয় মোট দেশজ আয়ের চেয়ে বেশি হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে দ্বিতীয়টিই সত্য।

নিট জাতীয় আয় (Net National Income বা NNI)

কোনো জাতির মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পুরণের ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বোঝায়।

কাজ : (১) GNI, GDP, CCA - এদের পূর্ণ রূপ দাও।

কাজ : (২) CCA (Capital Consumption Allowance) আসলে কী?

৬.২ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ-উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি (Measurements of Gross Domestic Product- Production, Income and Expenditure Approach)

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) মূলত তিনভাবে পরিমাপ করা যায়। যথা : উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach), আয় পদ্ধতি (Income Approach) ও ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)।

১. **উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach):** একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।
২. **আয় পদ্ধতি (Income Approach) :** এ পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব মোট দেশজ উৎপাদন = \sum খাজনা + \sum মজুরি + \sum সুদ + \sum মুনাফা। এখানে, \sum = সমষ্টি।
৩. **ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach) :** এ পদ্ধতিতে জিডিপি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রঙ্গানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রঙ্গানি (= রঙ্গানি - আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y = \sum C + \sum I + \sum G + \sum (X-M)$ এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, $(X-M)$ (রঙ্গানি - আমদানি) = নিট রঙ্গানি। এখানে, \sum = সমষ্টি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদন মোটামুটি কাছাকাছি হলো পরিমাপ সঠিক হয়েছে বলে ধরা হয়। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে, তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

৬.৩ মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (Per Capita Gross Domestic Product)

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে উক্ত বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক। বিশ্বব্যাংকের ধ্যানধারণা অনুসারে এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি

মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুমত বা উন্নয়নশীল। তবে বর্তমানে এ ভাবে না দেখে উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ হিসাবে দেখার রীতি চালু হয়েছে।

৬.৪ জিডিপির নির্ধারকসমূহ (Determinants of Gross Domestic Product-GDP)

মোট দেশজ উৎপাদন কর হবে তা নির্ভর করে দেশের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি, এসব সম্পদের পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতার উপর। এ জন্য এদেরকে মোট দেশজ উৎপাদনের নির্ধারক বলা হয়।

১. **ভূমি (Land) :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।
২. **শ্রম (Labour) :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিকের সংখ্যা যদি বাঢ়ে এবং সে যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, তবে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়।
৩. **মূলধন (Capital) :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুমত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।
৪. **প্রযুক্তি (Technology) :** প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, টেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।
৫. **সচলতা (Mobility) :** একটি অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমাণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে পাট চাষ করিয়ে ধান, গম বা ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।

৬.৫ জিডিপির হিসাববহির্ভুল বিষয়াদি (Factors not Included in GDP Calculation)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বলে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

- মূলধনী লাভ-ক্ষতি (Capital Gains & Losses):** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয়, অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে জিডিপি গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য।
- মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা (Intermediary Goods and Services):** জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জিডিপি গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।
- বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা (Goods and Services Free of Charge):** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন- ঘা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না বান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি কোনো পণ্য নয়। এ জন্য জিডিপি গণনায় এসব অপণ্যায়িত সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।
- অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় (No Consideration of Previous Production and Transaction):** যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে এক বছরের আয় আরেক বছরের আয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বস্ত, কাগজি লেনদেন জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
- সরকারি ঋণের সুদ (Interest on Public Debt):** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জন্য জিডিপি ৯৫% থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৬. বেআইনি কাজ (Illegal activities) : বেআইনি কাজ থেকে প্রাণ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজকে বোঝায়। যেমন- চুরি বা ঘুষের টাকা।

কাজ : মোট দেশজ উৎপাদনে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৬.৬ বাংলাদেশে মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Method of Estimation of GDP in Bangladesh)

বাংলাদেশে জিডিপি গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরো। পরিসংখ্যান ব্যরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহ হচ্ছে-

১. কৃষি ও বনজ সম্পদ : কৃষি দেশজ উৎপাদনের একটি শুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ধরাবাঁধাভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।

(ক) শস্য ও শাকসবজি : এ খাতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজারমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। যেমন- ২০১৫-১৬ সালে ছিল ১৩৪৩২২ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ১৪৩৭০৫ কোটি টাকা।

(খ) প্রাণিসম্পদ : এ খাতের হিসাবও চলতি বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণি সম্পদ উপখাতে ২০১৫-১৬ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩,১৬৫ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ৩৬,০২৬ কোটি টাকা।

- (গ) বনজ সম্পদ : বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে GDP বের করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ২২,৮২৭ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ২৫,৬৬৮ কোটি টাকা।
২. মৎস্য সম্পদ : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট মৎস্য আহরণের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব করা হয়। এখাতে ২০১৫-১৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৩,০৭৬ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ৫৯,৬২৭ কোটি টাকা।
৩. খনিজ ও খনন : শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খননকে আলাদা খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ খাতে (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশেধিত তেল এবং (খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন বিষয়ের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্যের হিসাব করা হয়। এসব খাতের হিসাব দেশজ উৎপাদনের দিক থেকে গণনা করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে এ খাতে আয় হয় ২৮,৫৭৮ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে হিসাব করা হয়েছিল ৩৪,১২৭ কোটি টাকা।
৪. শিল্প (ম্যানুফেকচারিং): বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন গণনার ক্ষেত্রে সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদন বের করা হয়। বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ২০১৫-১৬ সালে শিল্প উৎপাদন বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন যথাক্রমে ২,৯৫,১১১ কোটি টাকা; ২,৪০,১৬৪ কোটি টাকা এবং ৫৪,৯৪৭ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সালে শিল্প উৎপাদন বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন যথাক্রমে ৩,৪১,৮২৯ কোটি টাকা, ২,৭৯,২১৭ কোটি টাকা, ৬২,৬১২ কোটি টাকা।
৫. পাইকারি ও খুচরা বিপণন : এ হিসাবে পণ্যের পাইকারি মূল্য হিসাবের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ গণনা করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে ২,২৪,২৫৭ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ২,৪৩,৯৫৮ কোটি টাকা হিসাব করা হয়।
৬. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ : এ খাতে সেবা সরবরাহ মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদন মূল্য হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এই খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পাশাপাশি এ খাতসমূহ বেসরকারিভাবেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩,৮২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে (ক) বিদ্যুৎ উপর্যাতে ১৮,৪৪৭ কোটি টাকা। (খ) গ্যাস উপর্যাতে ৪,২৭৯ কোটি টাকা এবং (গ) পানি উপর্যাতে ১,১০৩ কোটি টাকা আয় হয়। ২০১৬-১৭ সালে এ তিনটি খাতের সমষ্টি ২৬,২৪৩ কোটি টাকা।
৭. নির্মাণ : নির্মাণ খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় ব্যক্তি, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে। বাস্তবে এ খাত থেকে যে পরিমাণ আয় হিসাব হওয়ার কথা তার তুলনায় কম হয়। কারণ চলতি বাজারমূল্য সরকার প্রদত্ত বেঁধে দেয়া মূল্য থেকে বেশি।

অর্থচ সরকারি বেঁধে দেয়া মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ১,২৬,৩৫৩ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ১,৪৬,১০৭ কোটি টাকা।

৮. **হোটেল ও রেস্তোরাঁ :** এই খাতের মোট দেশজ উৎপাদনের বিষয়টি উৎপন্ন দ্রব্যের ও সেবার বিক্রয় মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ১৭,০৫৮ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সময়ে ১৯,৩১৮ কোটি টাকা।
৯. **পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ :** এ খাত দেশজ আয় গণনার একটি বড় খাত। এ খাতটির বড় অংশ বেসরকারি হাতে ন্যান্ত আছে। তারপরও ২০১৫-১৬ সালে স্কুল আয় হয়েছিল মোট ১,৬৯,১৬৫ কোটি টাকা যার মধ্যে- (ক) স্কুল পথ পরিবহন উপর্যাতে ১,২৭,৮৯৫ কোটি টাকা, (খ) পানি পথ পরিবহন উপর্যাতে ১০,২০৬ কোটি টাকা, (গ) আকাশ পথ পরিবহন উপর্যাতে ১,৩৫২ কোটি টাকা, (ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপর্যাতে ৮,০৩১ কোটি টাকা এবং (ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ খাতে ২১,৬৮১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সময়ে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে মোট আয় হয় ১,৮৭,০৭৬ কোটি টাকা।
১০. **আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা :** এ খাতের হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাণ্ত মূল্যের ভিত্তিতে। ২০১৫-১৬ সময়ে এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬৩,৬০১ কোটি টাকা, যার মধ্যে- (ক) ব্যাংক উপর্যাতে ৫৩,৭৮৯ কোটি টাকা; (খ) বিমা উপর্যাতে ৬,৩২৭ কোটি টাকা এবং (গ) অন্যান্য খাত থেকে আয় হয় ৩,৪৮৫ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৭৩,২০৫ কোটি টাকা আয় হয়। উপর্যাত অনুযায়ী এ আয় যথাক্রমে ৬২,৩৮৯, ৬,৮০৮ ও ৪,০০৮ কোটি টাকা।
১১. **রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা :** এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাণ্ত আয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে। ২০১৫-১৬ সালে এ খাত হতে প্রাণ্ত দেশজ আয় ছিল ১,২৩,৭৪০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সময়ে ১,৪৪,৫৩৯ কোটি টাকা।
১২. **লোকঝোসন ও প্রতিরক্ষা :** এ খাত থেকে প্রাণ্ত দেশজ আয়ের হিসাব করা হয় মূলত ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১৫-১৬ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ৬৬,৭১১ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ৭৮,৪৪১ কোটি টাকা।

- ১৩. শিক্ষা :** বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করা হয় ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১৫-১৬ সালে এ খাতে দেশজ উৎপাদন ছিল ৪৬,৫১২ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালে ৫৬,৮৫৬ কোটি টাকা।
- ১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা :** স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিষয়টি হিসাব করা হয় ব্যয় পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদন ব্যয় ২০১৫-১৬ সময়ে হয়েছিল ৩৪,৭৫৮ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সময়ে ব্যয় ৩৮,৯৮৭ কোটি টাকা।
- ১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা :** এ খাতে ব্যয়ের দিক থেকে মোট দেশজ উৎপাদণ গণনা করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে এ খাত থেকে ১,৯৪,২৪৮ কোটি টাকা ব্যয় গণনা করা হয় এবং ২০১৬-১৭ বছরে ২,১৪,২১৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোট দেশজ উৎপাদনের ধারণা দাও।
২. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?
৩. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?
৪. GNI, GDP, NNI এদের পূর্ণরূপ দাও।
৫. CCA বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।
২. মোট দেশজ উৎপাদনের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।
৩. মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাববহির্ভূত বিষয়সমূহের বর্ণনা দাও।
৪. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির উপর্যুক্তগুলোর অবদান বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. জাতীয় আয় | খ. নিট আয় |
| গ. জিডিপি | ঘ. মাথাপিছু আয় |

২. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) গণনায় নিচের কোনটি ধরা হয়?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য | খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবার মূল্য |
| গ. সরকারি খণ্ডের সুদ | ঘ. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

বুমানা তাঁর বাড়ির আঙিনায় সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে পরিমাণ সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি সবজি পান।

৩. বুমানা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন?

- | | |
|--------------|----------|
| ক. ভূমি | খ. শ্রম |
| গ. প্রযুক্তি | ঘ. মূলধন |

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন-

- i. GDP বৃদ্ধি করে
- ii. GNI বৃদ্ধি করে
- iii. NNI ত্রাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা : ১

শিহাব ১০ বছর যাবৎ বাহরাইনে কর্মরত। তিনি প্রতি মাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে প্রেরণ করেন।

ঘটনা : ২

মিসেস ব্রাউনি বিটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতি মাসে তিনিও তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে?

খ. আয় পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ।

গ. শিহাবের অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস ব্রাউনির আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রত্বাবিত করবে? তোমার মতামত দাও।

২. জহির তার নানাবাড়ি মধুপুরে বেড়াতে যায়। তার নানা পুরুরে মাছ চাষ করেন। জহির তার নানাবাড়ির পাশে প্রচুর গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায়। সে জানতে পারে এটি একটি বিশেষ ধরনের অঞ্চল।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির তার নানাবাড়ির পাশে যে অঞ্চলটি দেখতে পায়, সেটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জহিরের নানার চাষকৃত মাছের অবদান বিশেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা

Money and Banking System

নাবিলের বাবা একজন চাকরিজীবী। মাসের শেষে বেতন পান ২০,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা নগদ রাখেন এবং কিছু টাকা ব্যাংকে আমানত রাখেন। কিছুদিন পর তিনি ঠিক করলেন মুরগির খামার দেবেন। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে খণ্ড নিলেন। ব্যাংক তাকে ১০% সুদে ৩৬ মাসে পরিশোধ করার লক্ষ্যে এই খণ্ড প্রদান করে। তাঁর আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও খণ্ড সবই অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থ ও খণ্ডের ব্যবসা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যাংক জনগণের উচ্চত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে খণ্ডাদ্বীভাবে খণ্ড হিসেবে প্রদান করে। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, আজ্ঞাকর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংক তুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



এই অধ্যায় পাঠ্যের আমরা-

- অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব
- অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারব
- কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আজ্ঞাকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের তুরুতপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব
- চার্ট অঙ্কন করে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারব।

৭.১ অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ (Money and Its Classification)

দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষক তার খানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমারের কাছ থেকে হাঁড়ি-পাতিল সঞ্চাহ করত। এভাবে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে সরাসরি পণ্য বিনিময় প্রথা (Barter System) বলে। আমাদের দেশের প্রাচীনকালে কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। তবে এ প্রথায় শেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো (যেমন- দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ও পাবল্পরিক অভাবের অবিল ইত্যাদি)। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবর্জনা ঘটে। আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজনীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও খণ্ডের ভিত্তি হিসেবে স্থীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রূপি, আমেরিকায় ডলার এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

অর্থের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

তৈরির উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। অথা-

- ১) ধাতব মুদ্রা ও
- ২) কাগজি নোট

ধাতব মুদ্রা

ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে।



বর্তমানে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা

ধাতব মুদ্রাকে বঙ্গগত মূল্যমানের দিক থেকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় । যথা : (ক) প্রামাণিক মুদ্রা (খ) প্রতীক মুদ্রা । প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায় যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় । আর প্রতীক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে । সাধারণত ধাতব মুদ্রা সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয় ।

কাগজি নোট

যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয়, তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে । নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত নোটের কাগজটির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় । প্রায় সকল দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয় । বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট ।

কাগজি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায় । যথা- (ক) রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা (খ) রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা ।

রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বুঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে । বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য নোট হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট । আর রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, বুপা পাওয়া যায় না । বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট । গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় । যথা : ১) বিহিত অর্থ ২) ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ ।

বিহিত অর্থ

যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত, তাকে বিহিত অর্থ বলে । আমাদের দেশের বিহিত অর্থ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত । বিহিত অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়-
 (ক) অসীম বিহিত অর্থ খ) সসীম বিহিত অর্থ । অসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্থ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে । আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট । সসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়, আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে । আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা ।

ব্যাংকসৃষ্ট অর্থ

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-গোপনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ বিনিয়ন মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা খণ্ডান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে।



ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা ওভার ছাকটের বিগ্রীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে। আমাদের দেশে ব্যাংকসৃষ্ট অর্থ হলো- চলতি হিসাবে আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত, যা চেকের স্থান তোলা যায়। এ ছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড বিনিয়নের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

কাজ : অর্থের প্রকারভেদের ছক তৈরি কর।

৭.২ অর্থের কার্যাবলি (Function of Money)

আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থায় এবং সমাজজীবনে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

কবি অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

বাহ্য করে বিনিয়য় ও মূল্য পরিমাপ

খণ্ড পরিশোধ আৰ সঞ্চয় সাধন

অর্থ বলি গণ্য তাৱে করে সৰ্বজন।

ইংরেজি কবিতার দুটি চূল্পনে অর্থের কার্যাবলি প্রকাশ পাই-

"Money is a matter of functions four;

A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ, অর্থের কাজ হলো চারটি। যথা : বিনিয়নের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, লেনদেনের বাহন ও সঞ্চয়ের বাহন।

নিচে অর্থের প্রধান চারটি কাজের বিবরণ দেখো হলো :

বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

মূল্যের পরিমাপক

মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম যেমন ওজনের পরিমাপক, ঠিক তেমনি অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আমির একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। অর্থের সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

সংগ্রহের বাহন

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ দ্বারা সবকিছু বিনিময় করা যায় বলে একে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে, কারণ অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলকভাবে স্থায়ী।

স্থগিত লেনদেনের বাহন

স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে খণ্ড গ্রহণ সহজ এবং ঐ খণ্ড পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিশেষে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রত্তিও খণ্ডপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব খণ্ডপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে খণ্ডের স্থগিত লেনদেনের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থমূল্য স্থানান্তরের বাহন, তারল্যের মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অর্থের এই কাজগুলো পৃথক নয়, এদের একটি অপরাটি থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। তাই বলা হয়, অর্থের সকল কাজের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

কাজ : অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে- ব্যাখ্যা কর।

৭.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

বে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আয়ানত হিসেবে জয়া রাখে এবং ব্যবসায়িক উচ্চেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিলা অনুমতী প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উচ্চেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ ব্যাংক আয়ানতকারীর জমাকৃত অর্ধের উপর কর হাতে সুদ দেয়। অন্যদিকে ব্যাংক খণ্ডক্ষীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হাতে সুদ আদান করে। উভয় সুদের পার্শ্বক্ষয়ই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমানদারকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ায়াজ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে বন্ধকালের জন্য খণ্ড প্রদান করে। তাই এ ব্যাংককে বন্ধকালীন খণ্ডের ব্যবসায়িক বলে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হলো : সোনালী ব্যাংক, জলন্তা ব্যাংক, কলকাতা ব্যাংক, অঞ্চলী ব্যাংক, পূর্বাঞ্চলী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, ফাই বাংলা ব্যাংক ইত্যাদি।



সোনালী ব্যাংক ভবন



জলন্তা ব্যাংক ভবন

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে আঁকড়ের একটি অগ্রিমার্থ প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কত হয়েছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. আয়ানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়ানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আয়ানত গ্রহণ করে। যথা- (ক) চলতি আয়ানত, (খ) সঞ্চলী আয়ানত, (গ) স্থায়ী আয়ানত।

(ক) চলতি আয়ানত : চলতি আয়ানতের অর্থ আয়ানতকারী থেকেন্তে সময় প্রাপ্তে পারেন। এজন্য এ আয়ানতের উপর কোনো সুদ আদান করা হয় না।

(৪) সঞ্চারী আমানত : সঞ্চারী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেরাদে সাধারণত সঞ্চারে দুবার ঘটানো থাই। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

(৫) ছান্নী আমানত : এ আমানত নির্দিষ্ট মেরাদের জন্য করা হয়। যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক ছান্নে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেরাদ শেষ হওবার আগেও তোলা থাই। একেতে কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়।

২. খণ্ড দান করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলকা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চাহিদা যোটানোর জন্য পঞ্জীত গ্রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেরাদের জন্য খণ্ড প্রদান করে। উপরূপ আমানত ও বকাকির যেমন- মূল্যবান খাত, ধাতব স্বত্য, সরকারি ও সেপ্টি-বিদেশি খণ্ডগুলি, ছান্নী সম্পদ ইত্যাদি এর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক খণ্ড প্রদান করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক গৃহনির্বাপ, মন্তব্য চাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে খণ্ড দেয়।

৩. বিনিয়নের মাধ্যম সূচি

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ বিনিয়ন মাধ্যম হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাকট, ই-পেমেন্ট, হান্ডি ও অমধ্যকারীর চেক ইত্যাদি সূচি করে। বিনিয়ন মাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশে অধিকাংশ সেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিপ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তার ব্যবসায়ীদের অর্থ রোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রাপ্তির্বৃত্তি প্রদান, বিল বাট্টাকরণ, আমদানি ও রক্ষানিকারককে খণ্ড প্রদান, সেইল ও টেলিয়ামের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবহী করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে স্বত্য আমান-প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রার অস্য-বিকল্প এবং জেল্টা-বিকেতাদের মেলা-পানোর নিপ্পত্তি হয়। এসব কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।



ব্যাংক কার্যক্রমে প্রযুক্তি

৫. অর্থ স্থানান্তর

গ্রাহকদের প্রয়োজনে ব্যাংক এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে। অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, মেইল ট্রান্সফার ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি।

৬. রেমিট্যাঙ্ক

বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তান্তর করে বাণিজ্যিক ব্যাংক যথাযথ সেবা প্রদান করে।

৭. সঞ্চয় বৃদ্ধি

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে খণ্ড দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে-

- (ক) জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন- দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে।
- (খ) বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, মেয়াদি ঝণপত্র (Debenture) ও সরকারি বণ্ণ ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে।
- (গ) সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অছির দায়িত্ব পালন করে।
- (ঘ) গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে।
- (ঙ) গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিয়য় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ : বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা কর।

৭.৪ ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

সুজন তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখার জন্য তার উপজেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখা অফিসে যায়। সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা মাসুদ সাহেব তাকে হিসাব খোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মাসুদ সাহেব প্রথমে সুজনকে তিন ধরনের যেমন- (১) চলতি হিসাব,

(২) সঞ্চয়ী হিসাব ও (৩) স্থায়ী হিসাবের ধারণা দেন। তিনি বলেন সব ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম মোটামুটিভাবে এক। আমাদের দেশের সব ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়মাবলি প্রায় একই ধরনের। সুজন সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে প্রথমে ব্যাংকের শাখা অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তাকে (আবেদনকারীকে) শনাক্ত করার জন্য আবেদনপত্রে সায়েমের তথ্যসহ স্বাক্ষর নিতে হয়। কেননা সায়েমের উক্ত ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। সায়েমকে শনাক্ত প্রদানকারী বা পরিচয়দানকারী বলে। এছাড়া আবেদনপত্রে সুজন স্ত্রীকে নমিনি করে তার তথ্যও লিপিবদ্ধ করে (নমিনি বলতে বোঝায় ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর অবর্তমানে/মৃত্যুর পর তার মনোনীত যে বা যারা জমাকৃত অর্থের অধিকারী হবে)।

পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে সুজন ও তার স্ত্রীর (আবেদনকারী ও নমিনির) পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করে। পূরণকৃত আবেদনপত্রটি মাসুদ সাহেবের কাছে জমা দেয়। তখন মাসুদ সাহেব তাকে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে বলেন (বিভিন্ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমার পরিমাণ কমবেশি হতে পারে)। কিছু সময়ের মধ্যে মাসুদ সাহেব ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে হিসাব খুলে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর সুজনকে প্রদান করেন এবং একটি চেকবই ও একটি জমাবই প্রদান করেন। সুজন পরবর্তীতে এ হিসাব নম্বরে জমাবই দ্বারা তার ইচ্ছামতো নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক ড্রাফট জমা দেয় (এছাড়া অনলাইনে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে হিসাব নম্বরে টাকা জমা দেওয়া যায়)। জমাকৃত টাকা থেকে চেকের মাধ্যমে ও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে (যেখানে এটিএম বুথ আছে) ব্যাংকের নিয়মের ভিত্তিতে টাকা তোলা যায়।

বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। তাই আমানতকারী কোন কোন তারিখে কত টাকা তুলল এবং কত টাকা জমা দিল তার বিবরণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে (এমনকি ইচ্ছা করলে তার হিসাব বন্ধ করে দিতে পারে)। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারী বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

সুজনের মতো সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো ব্যাংকে যেকোনো ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ জমাদান করতে এবং ওঠাতে পারে।

কাজ : ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটিটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।
যেমন : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, মুক্তরাতের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম এবং ইঞ্জানের ব্যাংক অব ইঞ্জান ইত্যাদি।



ব্যাংক অব ইঞ্জান ভবন



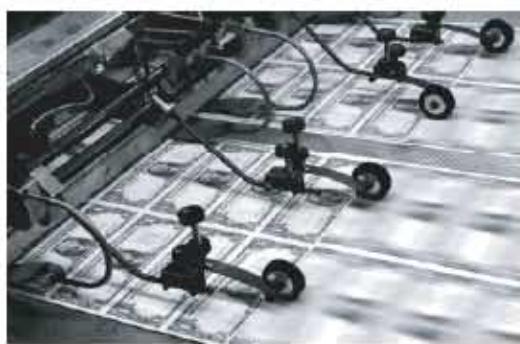
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ভবন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

প্রত্যেক দেশের ব্যাংক ব্যবহার ও মুদ্রাবাচালনের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিক অধিনীতির সার্বে বিভিন্ন ক্ষমতাগূর্ধ্ব কাজ সম্পাদন করে। নিম্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

১. নোট ও মুদ্রা প্রচলন

কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। এ ব্যাংক দেশের ধরোজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করে। অঙ্গীকৃত দেশে নোট প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইন অনুযায়ী সর্ব, মৌগ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা দ্বার্তে হতো।
বর্তমানে দেশে অর্থের বোঝান ও তাত্ত্ব মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভরশীল।



কাগজি নোট প্রচলন।

২. সরকারের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে। আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করে। তার অধীন তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। আইন বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে হয়। এ গচ্ছিত তহবিল হতে প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ দেয় তা মোট অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা দামন্ত্র এবং অর্থের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঋণের আধিক্যের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়। ঋণের স্বল্পতার জন্য দেশে মুদ্রা সংকোচন হয়। এসব অসুবিধা যেন দেখা না দেয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

৫. সর্বশেষ ঋণদাতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, টাকার বিপরীতে ডলার, ইউরো ইত্যাদির বিনিময় হার নির্ধারণ। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

৭. নিকাশ অন্তর্ভুক্তি

দেশপ্রিম ব্যবসায় বাণিজ্য ও সেচনদেশের কলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ছাফট ও পেজার্জার আমান-প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পার্শ্বান্বয় বা দেনান্বয় হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কক পাওনা বা কক দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংযোগে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা উত্তরাধিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে, তা থেকে এরকম দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে। এভাবে এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের চেক, ব্যাংক ছাফট ও পে-জার্জারের নিকাশের হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যবলি সম্পাদন করে-

- (ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের নিরোজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- (খ) অধিকৃত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে হয়েছে কি না তা সম্বাদে ঘোষণা করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।
- (গ) অনগ্রহের সুবিধার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি ও বাস্তবান্বন করে।
- (ঘ) দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপনে সহায়তা করে।
- (ঙ) দেশবাসীর অবস্থার অন্য এবং সরকারের আর্থিক নীতি প্রয়োজনের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যবলির উপর সশ্রেষ্ঠ ও সংকলন প্রকাশ করে এবং গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।
- (চ) অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাত, যেমন- কৃষি, শিল্প, সেবা (ব্যবসা- বাণিজ্য, শিক্ষা, বাস্তু) খাতের উন্নয়নের অন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি প্রস্তুত করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক হিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অনগ্রহের সার্বিক কল্যাণসাধনে ক্রমতপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কাজ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক হিতিশীলতা বজায় রাখতে পাওয়া- ব্যাখ্যা কর।

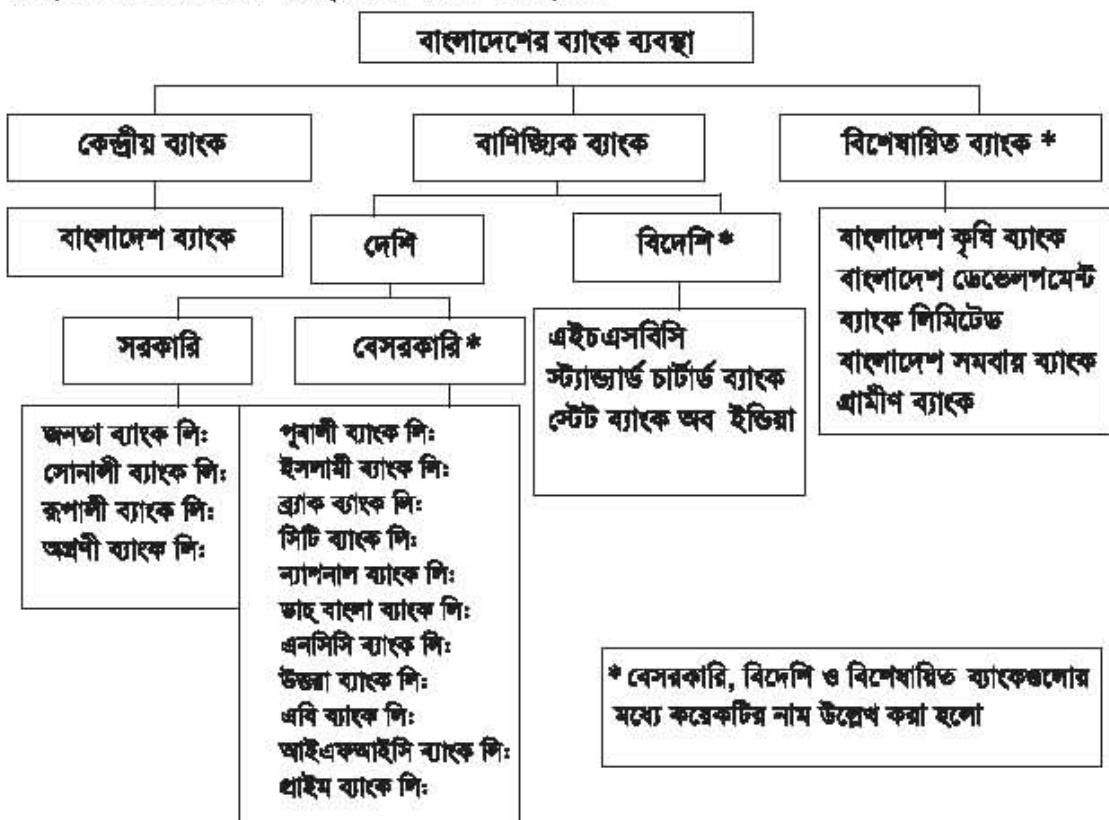
৭.৬ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মুদ্রাব্যবস্থার জৰি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খণ্ড প্রদান করে মূলকা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দায়িত্ব প্রয়োজনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষাধিক খণ্ডানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।



ব্যবস্থাপনা নিকাশসভা

নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার চার্ট অঙ্গন করা হলো :



৭.৭ কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আজ্ঞাকর্মসংহালে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার সূচিকা
বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংকের সূচিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাধীনভা লাভের পর দেশের ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থার
নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির
“বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২”-এর বলে বাংলাদেশে
অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সকল
সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ
ও ধর্মব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে রিতিশীল
মূল্যস্তর বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন,
শিল্পায়ন ও আজ্ঞাকর্মসংহাল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক
সমৃদ্ধি এবং জনগণের সামাজিক কল্যাণসাধনে এ ব্যাংক নিম্নোক্তভাবে সূচিকা পালন করে :



সর্বোচ্চ (বাংলাদেশ ব্যাংক)

দেশের কৃষি খাতে প্রয়োজনমাফিক কৃষিক্ষণ সরবরাহে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিখণ্ডানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদারভাবে খণ্ড তহবিল প্রদান করে। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরি করে এ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে।

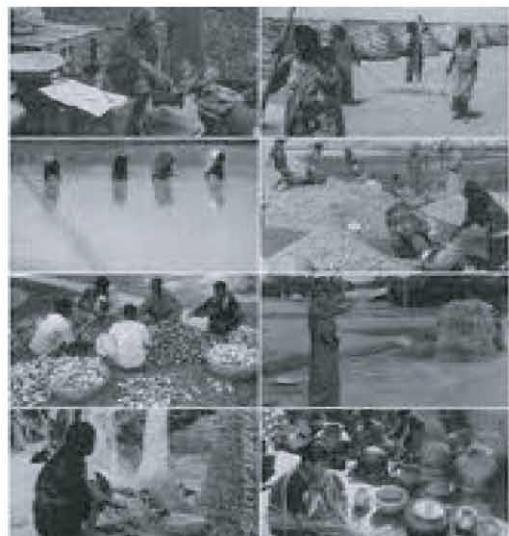
দেশের দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প মূলধন সরবরাহকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে খণ্ড তহবিল সরবরাহ করে। শিল্প উদ্যোগো শ্রেণি-বিকাশে উন্নুনকরণ খণ্ড সহায়তা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে খণ্ডপত্রের বিনিয়য়ে খণ্ড প্রদান, নতুন ব্যাংক স্থাপন এবং অনুমত এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করে, খণ্ডের যোগান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় খাতে খণ্ডের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যাংক নিজ উদ্যোগে সহজ শর্তে খণ্ড প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

কাজ : অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে
বাংলাদেশ ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-



কৃষি ও শিল্প খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ফলে কৃষি উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। এ দেশের অধিকাংশ কৃষক গরিব। তাই তাদের কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য দরকার পর্যাপ্ত কৃষিখণ্ডের। বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সরকার ঘোষিত কৃষি খণ্ডান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক দ্রব্য, পানি সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি খণ্ড প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের কৃষক মাত্র ১০ টাকা জমা রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে। এতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ সকল কৃষকের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিঞ্জা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কাজ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রায়ন্ত ও আধা-স্বায়ত্ত্বাস্বীত প্রতিষ্ঠান। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

ক. আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাই কৃষকের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য (যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ক্রয় এবং জমি চাষ, ফসল নির্ডানো, ফসল কাটা, মাড়ই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য) এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

খ. জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন, চাষের জন্য গবাদিপশ্চ এবং হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষককে মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ. জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন- ট্রান্স্ট্র, হারভেস্টর ইত্যাদি) ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক হাঁস-মুরগি ও পশ্চপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্য খণ্ড দিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমাদের বেকার যুবকরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

কাজ : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিখণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্বন্ধ-ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে Vendors Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প খণ্ড সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটির দায়, সম্পদ ও জনবল নতুন প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পিত হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে খণ্ড প্রদান করে, যেমন- পাটশিল্প, চামড়াশিল্প, চিনিশিল্প ও সারশিল্প ইত্যাদি। পল্লি এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

এই ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি খণ্ড দিয়ে থাকে। এই ব্যাংকের খণ্ড পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার প্রয়োজনে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি খণ্ডও প্রদান করে। উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং শিল্পায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা, পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদি খণ্ড প্রদান করছে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। বেসরকারিভাবে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দান ও শিল্প কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

কাজ : উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের ভূমিকা লিখ।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে এ ব্যাংক ক্ষুদ্রখণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। এটি সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক নয়। আইনত এর প্রধান মালিক হচ্ছেন এর দরিদ্র ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকবৃন্দ। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত ছাড়া খণ্ড প্রদান করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে খণ্ড প্রদান করে। এ ব্যাংক পর্যাণ খণ্ড প্রদান করায় কৃষককে গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ও চড়া সুন্দে খণ্ড নিতে হয় না।

দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে অকৃষি খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ স্কুল ও কুটির শিল্পে (যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, বিড়ি তৈরি, সাবান তৈরি, কাপড় তৈরি ও মিটি তৈরি) খণ্ড প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। গ্রামীণ ফোনের কারিগরি সহায়তায় গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ পৌছে দেওয়ার জন্য পলিফোন চালু করে।

সুবিধাবণ্ডিত বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংস্থবজ্জ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এ ব্যাংক ডিস্কুককে সুদবিহীন খণ্ড প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীকে কর্মে উত্তুলকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে। দরিদ্র অসহায় নারীদের খণ্ড হিসেবে পলিফোন প্রদান করা হয়। এর আয় থেকে খণ্ড পরিশোধ করে নারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়। প্রতিবছর এর লভ্যাংশ থেকে দরিদ্র গ্রাহক মালিকদের ডিভিডেণ্ড (Dividend) প্রদান করা হয়।



গ্রামীণ ব্যাংকের স্কুল ও কুটির শিল্প

কাজ : সুবিধাবণ্ডিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

সমবায় ব্যাংক

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারম্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুন্দে খণ্ড প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকারি ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানায়। নিম্নে সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষির প্রদান করে। খণ্ড প্রদানের খাতগুলো হলো- কৃষি, ভূমি উন্নয়ন, আউশ, আয়ন ও বোরো ধান চাষ, শীতকালীন ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, সেচবন্ধ ও ট্রাইট ইত্যাদি। কৃষি খণ্ডের যেয়াদ তিনি ধরনের হয়, যেমন : শীতকালীন- ৬ মাসের জন্য, মধ্যম যেয়াদি- ২ বছরের জন্য এবং দীর্ঘকালীন- ৫ বছরের জন্য প্রদান করে।

সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণশিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে।

এ ব্যাংক গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য স্কুল শিখ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের অংশীদার সমবায় ব্যাংক। এছাড়া দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়, যেমন- মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। যার ফলে দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থ বলতে কী বোঝায়?
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?
৩. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি?

ক. খণ্দান	খ. আমানত গ্রহণ
গ. অর্থ স্থানান্তর করা	ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি
২. নিচের কোন মুদ্রা যেকোনো পরিমাণে লেনদেন করা যায়?

ক. ২ টাকার কয়েন	খ. ২ টাকার কাগজি মুদ্রা
গ. ৫ টাকার কয়েন	ঘ. ৫ টাকার কাগজি মুদ্রা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও

আরিফ তার সঞ্চিত অর্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখে। বছর শেষে সে তার জমাকৃত অর্থ অতিরিক্ত অর্থসহ উত্তোলন করে।

৩. আরিফের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ক. বাংলাদেশ ব্যাংক | খ. সমবায় ব্যাংক |
| গ. সোনালী ব্যাংক | ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক |

৪. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান হচ্ছে —

- i. পুঁজি গঠন করা
- ii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ
- iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. রত্না একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণকে খণ্ড দিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তার বান্ধবীও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এটি জনগণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

- ক. বিনিয়য় প্রথা কী?
- খ. সংগ্রহের বাহন হিসেবে অর্থের কাজ বর্ণনা কর।
- গ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. হারুনের স্তৰির একটি শাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছে একটি ছাগল ছাঢ়া কিছুই নেই। হারুন তার ছাগল নিয়ে তাঁতির কাছে গেলে তাঁতি একটি শাড়ির বদলে ছাগল নিতে চায়। কিন্তু হারুন একটি শাড়ির বদলে ছাগলটি দিতে রাজি হয়নি। ফলে এই ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অসুবিধা দূর হয়।

ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে?

খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

গ. হারুন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

The Economy of Bangladesh

জনাব ইসলাম একজন খীরী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য ফসল উৎপাদিত হয়। পানিবাহিক ব্যাপক বহন করার পর উচ্চ অভিযন্তা অর্থ জনাব ইসলাম সংগ্রহ করেন। গত বছর তিনি একটি ছোট তৈরি পোশাক কারখানা খুলে করেন, যা তার খীরী জমিতে পরিচালনা করেন। সেখানে তাঁর প্রায়ের নারী শ্রমিকদের কাজ করে। তাঁরা কানের একমাত্র হেলে রুনীকে একটি ভালো ঝুলে ভর্তি করেন। তাঁর অসুস্থ হলে তাকে ইউনিয়ন স্থান্ত্র কমিশনের ভাঙ্গারের পরামর্শদত্ত চিকিৎসা দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেমন : কৃষি, শিল্প এবং সেবা।



এই অধ্যায়ে পাঠশেবে আসবা—

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনীতির অধান বাস্তসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের অর্থনীতিকে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তুলনামূলক উচ্চতা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কৃষি ও শিল্পের প্রারম্ভিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারব;
- ধাতবিক অর্থনীতির তথ্য-উপার্থ ব্যাখ্যা এবং পারিস্থিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব এবং
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চির অঙ্গকৰণ করে প্রদর্শন করতে পারব।

৮.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস লোকস ও ২৪ বছরের গুরুত্বপূর্ণ শাসনের জোড়াকলে নিম্নগতিত হয়ে বাংলাদেশে উত্তোলনোগ্রহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নম্র যাসের বাধীনভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। চার্চিনকা শাকের পর চার সপ্তক খেয়ে উন্নয়নের কলে বাংলাদেশের উত্তোলনোগ্রহ অর্থনৈতিক অবগতি সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন একটি নিম্নমাত্রম আধুনিক উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নিম্নগতিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই জড় করা যায় :

১. কৃষি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির কর্তৃত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুভূত চাষ পছতি, ফর্ম বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিকলের অভাব, প্রাকৃতিক মুর্মোগের কারণে উন্নত দেশের পুলনায় আবাসের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমাগতে এ অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ফর্ম বীজ, সার, কীটনাশক, লেচন্যুবিদ্যা বাঢ়ছে। একই সাথে উৎপাদনও বাঢ়ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (কলা, প্রাপ্তিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও অঞ্চল সম্পদ) অবদান প্রায় ১৪.৭৩ শতাংশ হচ্ছে। কিন্তু দেশের আমদানির যোট ৪০.৬০ শতাংশ কৃষিখাতে সিজালিত (এল. এক. এস., ২০১৬ বিবিএস)।



কৃষিকাজ

২. শিল্প

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বাঢ়াতে আবশ্যিক শিল্পনীতি ঘোষণা আবশ্যিক। এ পরিস্থিতিতে শিল্পনীতি ২০১৬ স্থোরণ করা হচ্ছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- কর্মসংস্থান বাঢ়ানো, শিল্পায়নে নাগীনের অংশহীন বৃক্ষ এবং দায়িত্ব করানো। এই শক্তপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচি হলো- বিনিয়োগ উন্নাহিত করা, মূলধনের অবাধ অবাধ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃক্ষ, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং



কারখানায় কর্মসূচক প্রক্রিয়া

শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন। এসব কর্মসূচির সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩২.৪২ শতাংশ। কিন্তু মোট শ্রমশক্তির ২০.৪০ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। (এল. এফ. এস., ২০১৬, বি.বি.এস)

৩. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি

এ দেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। ২০১৮ সালে চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ১৬৭৭ মার্কিন ডলার। আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে।

৪. জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি

স্বল্প আয়ের জন্য ২০১০ সালে আমাদের দেশের প্রায় ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছিলেন। ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ধীরগতিতে হলেও জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুক্ষাল ২০১৬ সালে ৭১.৬ বছরে উপনীত হয়েছে। সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৮ শতাংশ এবং সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) ৭১ শতাংশ।

৫. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি

আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই বিনিয়োগ বা পুঁজি গঠনের হারও কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক উদ্দীপনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি যোৰণ করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩১.৪৭ শতাংশ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৬. খাদ্যঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশে বছদিন ধরে খাদ্যঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা লক্ষ করা যায়। তাই সরকার বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নত বীজ, সার এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৬.৩৪ লাখ মেট্রিক টন।

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ত্রাস

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী এ দেশে মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ ত্রাস পেলেও আয়তনের দিক দিয়ে অনেক ছোট এই দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশেষ নবম বৃহত্তম দেশ। ২০১৭ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৮ লাখ এবং মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। সেই অনুযায়ী বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০৯০ জন।

৮. বেকারত্ত

আমাদের দেশে জলসংর্ক্ষণ বৃক্ষিক ভূলভায় সঞ্চয় কর বলে বিনিয়োগ কর হয়। কিন্তু মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুবোগ সীমিত। কিন্তু এ দেশে বেকারত্ত দেখা যায়।



চাকা ইপিজেড

তবে ইতানি প্রতিনির্বাচিতকরণ অঞ্চল (EPZ: Export Processing Zone) বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ বৃক্ষি পাছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উকীলনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাঢ়ছে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হচ্ছে। বার ফলে বেকার সমস্যা অন্তর্ভুক্তে আরো কমে যাবে বলে আশা করা হার।
(২০১৪-১৫ সালে অম্পত্তির প্রায় ২৫ লাখ লোক বেকার ছিল)।

৯. আকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃক্ষি
দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের
জীবনবাসার মানোন্নয়নে আকৃতিক সম্পদ ভূজুড়ুর্ণ
যৌগিক অবকাঠামোগত উপাদান। বর্তমানে এসব
সম্পদের আবিকার ও ব্যবহার পূর্বের ভূলভায় বৃক্ষি
পেয়েছে। জিডিপিতে আকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত
পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ
খাতের সংবিধিৎ অবদান হিসেবে ২০১৬-১৭
অর্থবছরে ১.৮০ শতাংশ হয়েছে। আকৃতিক গ্যাস
দেশের মোট বাণিজ্যিক জালানি ব্যবহারের শতকরা



কয়লা খনি

প্রায় ৭১ ভাগ পূর্ণ করে। আমাদের দেশে এ ধৰণ আবিকৃত ২৭টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ২১টি গ্যাসক্ষেত্রের ১১০টি কৃপ হতে গ্যাস উৎসোধিত হচ্ছে। উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক
ব্যবহৃত হয়। দেশের জালানি নিরাগনা নিচিতকরণকাজে ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশেষেন ক্ষমতা বৃক্ষি
এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single
Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট মোট কয়লাক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর,
মিনারপুরের বড়পুরুয়া, মুলবাড়ি ও দীর্ঘিপাড়া এবং বঙ্গড়ার জামালগঞ্জ) মোট মুছু প্রায় ৩৩০০
মিলিয়ন টন। উৎসোধিত কয়লার ৬৫ ভাগ বড়পুরুয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নের সক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবাবলন করা হচ্ছে।
এসের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, মূব ও জীড়া উন্নয়ন, সংকৃতি, শ্রম ও
কর্মসংস্থানক্ষেত্রে উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

১০. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুবৃদ্ধি চাইদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের রঙানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এ জন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে অব্যাহত ঘাটতি দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর রঙানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের (রেমিটেন্স) কারণে আমাদের চলাতি হিসাব খাতে ঘাটতি দূর হয়ে উঠতে সৃষ্টি হয়েছে।

১১. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তাই বৈদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আশার কথা হলো বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাস পাচ্ছে। কেননা এসব সাহায্যের অপর্যাঙ্গতা, অনিশ্চয়তা, প্রতিকূল শর্তসমূহ ও সময়স্কেপশনের দ্রুণ আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বাঢ়ছে, যা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাবোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখ্যবোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পঞ্চ সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ খাতের ক্রমবর্ধমান চাইদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং ছাতীয় একটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে



গঞ্জ ত্রিভুবন

জাতীয় শিক্ষাবৈত্তি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন খাত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়েছে।

১৩. বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারীকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটেইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৭টি রাষ্ট্রীয়ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলাফল মিশ্র প্রকৃতির।

১৪. পরিকল্পনা গ্রহণ

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং সম্পদের সুব্যবস্থার বর্ণন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে “বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)” শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রযুক্তি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানসম্পদ শ্রমিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। তারা স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে ভূমিকা পালন করছে। ফলে সুশাসনের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

কাজ : বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Bangladesh Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত



কৃষি খাতে (Agriculture Sector)

কৃষিকাজ হচ্ছে ভূমিকর্ম, বীজ বপন, শস্য-উদ্ধিন পরিচর্যা, অসল কর্তৃল ইত্যাদি থেকে করু করে উৎপাদিত পণ্য উদামজাতকরণ, সম্পর্কশ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রম। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।



মৎস্য চাষ



পশুপালন



সুস্থরবন

নিম্নে কৃষি খাতের উৎপাদনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

ক) শস্য ও শাকসবজি

আবাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ভাল, আখ, তামাক, ঢা ও তৈলবীজ ইত্যাদি আর শাকসবজির মধ্যে আলু, শিম, লাউ, মটরসুটি, পটল, করলা ও বেঙ্গল ইত্যাদি উৎপাদন করে।

খ) পানিসম্পদ

আবাদের দেশে পানিবারিকভাবে ও বাণিজ্যিক তিনিটে হাঁস-যুবরাঞ্চি, গরু-ছান্সল, কেড়ো, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর ও অন্যান্য পাখি পালন করা হয়। এদের মাস, তিম, দুধ, পালক ও চামড়া ইত্যাদি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

গ) বনজ সম্পদ

আবাদের দেশের মোট কৃষকের পায় শক্তকরা ১১.১ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল, যেখানে একটি দেশের ধাকা উচিত মোট কৃষকের শক্তকরা ২৫ ভাগ। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, পর্ণম, সুন্দরী, গুরান, পেঁপেয়া, গামারি, কড়াই, কুচি ও কেওড়া ইত্যাদি গাছ। এগুলো থেকে কাঠ, রাবার, পাম-কৈল, শথ, মোঝ ও মধু ইত্যাদি আমরা শেষে ধাকি।

ঘ) মৎস্য সম্পদ

এ দেশের মদী-সালা, ধাল-বিল, শুকুর, হাতুর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত মুছ্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। বেমল- মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো কুই, চিতল, কই, শিং, মাতুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো, রূপচানা, কেঁজকি, লাইটা ইত্যাদি। সম্প্রতি মৎস্য খাতে উৎপাদন ঘূরে বৃক্ষি পান্তিয়ার সরবরাহ মৎস্য খাতকে একটি গৃহক খাতের হর্বাদা প্রদান কর্যালয়েন।

কৃষি খাতের অবদান বা গুরুত্ব

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বহুলাশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষিখণ্ড প্রদান, কৃষিবিমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৩৮৬.৩৪ লাখ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাণ শণ, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এ দেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিচের তালিকায় জিডিপিতে কৃষি ও কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের অবদানের হার উল্লেখ করা হলো-

খাত/উপখাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১. কৃষি ও বনজ	১১.১২	১০.৫৪
ক. শস্য ও শাকসবজি	৭.৮৬	৭.৩৭
খ. প্রাণিসম্পদ	১.৬০	১.৫৪
গ. বনজ সম্পদ	১.৬৬	১.৬৩
২. মৎস্য সম্পদ	৩.৬১	৩.৫৭

অতএব, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি (১+২) খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৪.৭৩ শতাংশ এবং ১৪.১১ শতাংশ। কৃষি খাতের প্রধান প্রধান রঙানি পণ্য যেমন : হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১. কৃষি ও বনজ	১.৯৬	২.০১
ক. শস্য ও শাকসবজি	০.৯৬	০.৯৮
খ. প্রাণিসম্পদ	৩.৩১	৩.৮০
গ. বনজ সম্পদ	৫.৬০	৫.৫১
২. মৎস্য সম্পদ	৬.২৩	৬.৩০

শিল্প খাত (Industry Sector)

প্রকৃতি অদ্যত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক মূব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রকৃত প্রযোগের মাধ্যমে মাধ্যমিক মূব্য বা চূড়ান্ত মূব্যে উপার্জিত করাকে শিল্প বলে।

বাংলাদেশের আভীয় আয় নির্বায়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতজোৱা সমস্যার সার্বিক শিল্প খাত গড়ে উঠেছে।



গ্যাসকেন্দ



একটি বিদেশি মোটো রেলওয়ে



জাহাজশিল্প

শিল্প খাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো :

১. খনিজ ও খনন

এ খাতের অধিন উপখাত হলো-

ক) আকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল

খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন (কয়লা, চুলাগাঁথর, টীনামাটি, গুৰুক, কঠিন শিল্প, সিলিকা বালু ও ডামা ইত্যাদি)

২. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প : নিম্নে আলাদাভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উল্লেখ করা হলো :

বজ্রশিল্প, চিনিশিল্প, সারশিল্প, সিমেটেশিল্প, জাহাজ নির্মাণশিল্প, পাটশিল্প, কাগজশিল্প অভূতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো, চামড়াশিল্প, তেরি পোশাকশিল্প, সিগারেট শিল্প, প্রাস্টিক শিল্প, হেসিরারি শিল্প ইত্যাদি।

খ) কৃষ্ণায়তন শিল্প : নিম্নে কৃষ্ণায়তন শিল্প দুই ভাগে উল্লেখ করা হলো :

কুসুম বাজারণ তেরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠশিল্প, সাবানশিল্প, অসাধনীশিল্প এবং ঘানবাহন সার্ভিস ও যেজায়তশিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কৃসুম শিল্প।

রেশমশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, পিতল ও কাঁসাশিল্প এবং তোকশিল্প ও মুখশিল্প উল্লেখযোগ্য কৃটির শিল্প।

গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি : এ খাতের উপখাত গুটি হলো- ক. বিদ্যুৎ, খ. গ্যাস ও গ. পানি

B. নির্মাণ শিল্প : এই খাতে অজরুক - সেতু নির্মাণ, নতুন রাজাবাটি নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

উপরিউক্ত চারটি খাতের সমষ্টিয়ে সার্বিক শিল্প খাত গঠিত।

শিল্প খাতের অবদান বা শতাংশ

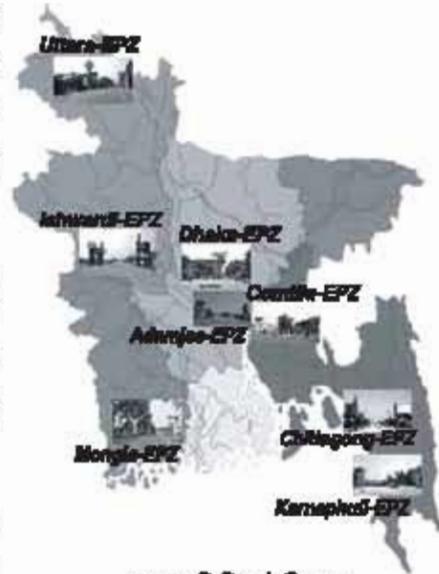
২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩২.৪২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩৩.৭২ শতাংশ হয়েছে।

নিচের তালিকায় সার্বিক শিল্প খাতের অবদান শৃঙ্খিতে হ্যার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১. ধনিক ও খনন	৮.৮৯	৮.৪৮
২. মানুক্যাকচারিং শিল্প	১০.৯৭	১৩.১৮
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসংস্থান	৮.৪৬	৮.৫৬
৪. নির্মাণ	৮.৭৭	১০.১১

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দায়িত্ব বিয়োগ, শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ ঝঞ্জানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ঝঞ্জানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ণ করে দেশে শিল্প খাত বিকাশ সহিত সম্পৃক্ষিত অবদান করে আসছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি EPZ [চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুল্লা, কুমিল্লা, ইন্দোনেশী, উত্তরা (নীলকামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী] এ ৪৬৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনস্থল রয়েছে; ৪,৮৫,৯১৫ জন বাংলাদেশি বাণিজ্যিক সেবানে কর্মরত এবং ৪,৬৯৯.৮৩ শিলিঙ্গ মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে ঝঞ্জানি করা হয়েছে।



অঞ্চলভিত্তিক ইপিজেড

দেশের শিল্পায়নের পতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করেছে। এ নীতির অন্তর্গুর্ণ উচ্চেশ্বর হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মার্বাকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দায়িত্ব সূচীকরণ এবং ক্ষমতা ও মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন। উন্নয়ন কাপক্ষ-২০২১ অনুবাদী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত পক্ষে উচ্চবে বেগবান জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ।

কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহসংস্কার সেবা আনন্দনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জেল ও বিত্তী আকৃতিক সম্পদের চাহিদা উপর বৃক্ষ পাঞ্জে, তাই সরকার এ খাতে বিত্তী সেবাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ-সুবিধার আপত্তির আনন্দ ব্যাপারে সরকার অভিজ্ঞাবন। তাই সরকার ২০২৩ সালের মধ্যে ২৫ হাজার হেক্টারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করেছে। আকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রকরণ প্রায় ৭১ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। রাসায়নিক সার তৈরির কাঠামোল জলপ, কলকারখনা, পরিবহন ও পৃষ্ঠ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সিলেট, কামৰূ, সাবান, খুলিং পাইকার উৎপাদনে হুমাপাথর; বাসমগ্ন ও চ্যানিটারি মুক্ত তৈরিতে চীমায়াটি; কাঁচ ও রাসায়নিক মুক্ত তৈরিতে সিলিকা বালু; বারুদ ও দিঘাপালাই কারখানার এবং কেল পরিশোধনে প্রক্রিয় হচ্ছে। অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃক্ষ পাঞ্জার নির্মাণ খাতে প্রযুক্তির হার বাঢ়ছে।

উপরিকৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাব, সার্বিক শিল্প খাতের মুক্ত বিকাশের আব্যাসে জাতীয় আর মাধ্যমিক আর বৃক্ষ, জীবনব্যবহার মাল উৎপন্ন, বাণিজ্য-ছাতক সূর করার পাশাপাশি পরমিত্বসীলভা হাস করা সহজ।

কাজ : সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আবাসের দেশের মুক্ত উন্নয়ন সম্ভব - ব্যাখ্যা কর।

সেবা খাত (Service Sector)

অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবকল্পিত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যা জলপাত্ৰিত কাঠামোল হিসেবে মুক্তামুক্ত কিন্তু যান্মুক্তের বিত্তী অভাব পূরণ করে এবং যার বিশিষ্ট ফুল্য রয়েছে, তাকে সেবা বলে।



আর্থিক প্রতিক্রিয়া



পরিবহনব্যবহা

বাসাদেশে পাইকারি ও খনন বিলৱন, হোটেল ও রেজোর্স, পরিবহন, সম্পর্ক ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিদ্যা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিক্রিয়া, গৃহসংস্কার, লোকপ্রশাসন ও অভিজ্ঞতা, শিল্প, বাজ্য ও সামাজিক সেবা, কঠিনজিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রক্রিয়া কেবলে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা অর্থের বিনিয়নে

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। প্রথমীয় অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫২.৮৬ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে ৫২.১৮ শতাংশ। সার্বিক সেবা খাতের অঙ্গভূক্ত উপকাতসমূহের জিডিপিতে অবদানের হার নিচের তালিকায় দেখানো হলো :

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.০১	১৪.০২
২. হোটেল ও রেস্টোরাঁ	০.৭৫	০.৭৫
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.০৫	১১.২৩
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	২.৮৮	২.৯৯
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বিমা	৭.৬১	৭.৪৮
৬. লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.২৬	৩.৩৩
৭. শিক্ষা	২.২৩	২.২১
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৯৬	১.৯৫
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১১.০৮	১০.৭২

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে অবদান সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত হলো পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাত যার অধীনে রয়েছে-

ক) ছলপথ পরিবহণ

যার আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১৬ সাল অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৩,৮১৩ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪,২৪৭ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,২৪২ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি, ড্রয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি এবং মিটার গেজ ১,৮৪৩ কি.মি.)।

খ) জলপথ পরিবহণ

আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মুংগুলা। আর অভ্যন্তরীণ পরিবহন কর্পোরেশনের ১৮৮টি জলযান দ্বারা ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।

গ) আকাশপথ পরিবহণ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করছে। এ ছাড়া ২টি স্টেল পোস্ট ব্যবহার উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারী ২০১৭ এ গ্রাহকসংখ্যা ১২.৮ কোটি অতিক্রম করেছে।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপর্যুক্তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৮ শতাংশ।

মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক সেবা খাতের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৭.৩৭	৭.১৭
২. হোটেল ও রেস্টোরাঁ	৭.১৩	৭.২৮
৩. পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৭৬	৬.৩৩
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	৯.১২	৭.৯০
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বিমা	৮.৮০	৮.৮০
৬. লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯.১৫	৯.২৪
৭. শিক্ষা	১১.৩৫	৭.৯৩
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৬৩	৭.০২
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৬২	৩.৬৫

এ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে, সর্বোপরি সুস্থান্ত্রের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাজ : বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর।

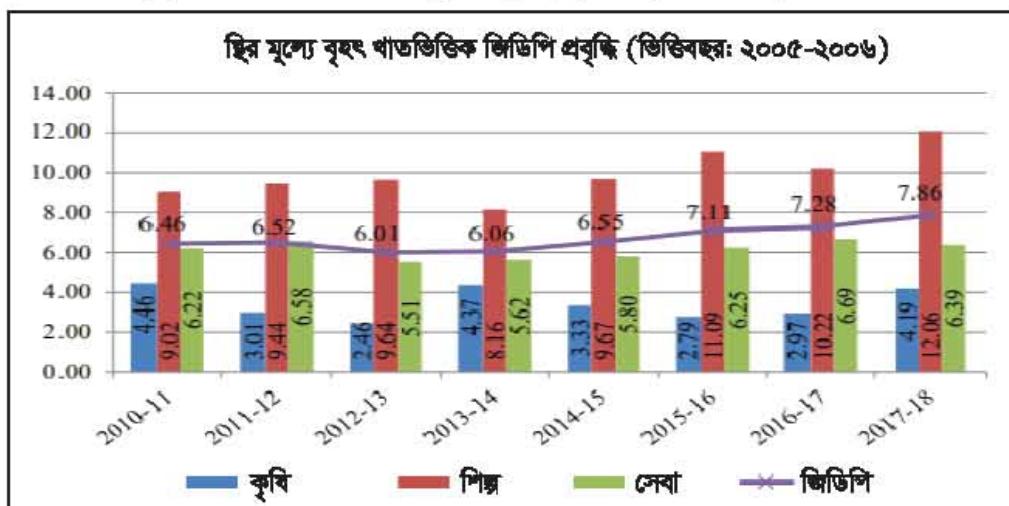
৮.৩ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা-এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তির একটি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিগুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিবড়, জলচোষ্টাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্ন মুখী কার্যক্রম, যেমন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও

পিণ্ড উন্নয়ন, শুরু উন্নয়ন, কৌড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে বর্তমান সরকারের কাগজকাঠ ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

এ উচ্চেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃক্ষি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নরবচিহ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিখন্দের প্রবাহ বৃক্ষি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাঙ্গভা সহিতু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রত্তি কৃষি খাতে প্রবৃক্ষি সঙ্গোষ্জনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিরোগ বৃক্ষির কলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃক্ষি পেয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটায়টি প্রবৃক্ষি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃক্ষি ও সঙ্গোষ্জনক পর্যায়ে রয়েছে।

নিচের শেখচিত্রে বৃহৎ ধার্তভিত্তিক জিডিপির প্রবৃক্ষির হার (%) উপস্থাপন করা হলো :



উপরোক্ত শেখচিত্রে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ এই তিনি বছরের জিডিপির প্রবৃক্ষির হারের কালানুক্রমিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখানো হয়েছে যে ২০১৫-১৬ সালে জিডিপির প্রবৃক্ষির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালে ছিল ৭.২৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। অর্ধাং শুরু হীরে হলেও আমাদের জিডিপি প্রবৃক্ষির হার বাড়ছে। জিডিপি প্রবৃক্ষির ক্ষেত্রে প্রধান যে তিনটি খাত অবদান রেখেছে, তারা হচ্ছে:- কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাত। উপরোক্ত চিত্রে বছরের মাধ্যমে এই তিনটি খাতের প্রবৃক্ষির হারের তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে। কৃষি খাতের প্রবৃক্ষির হার এই তিনি বছর যথাক্রমে ছিল ২.৭৯ শতাংশ, ২.৯৭ শতাংশ এবং ৪.19 শতাংশ। অনুগ্রহভাবে শিল্প খাতের প্রবৃক্ষি হার ছিল যথাক্রমে ১১.০৯ শতাংশ, ১০.২২ শতাংশ এবং ১২.০৬ শতাংশ। সেবা খাতের প্রবৃক্ষির হার ছিল যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ, ৬.৬৯ শতাংশ এবং ৬.৩৯ শতাংশ। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের জিডিপি প্রবৃক্ষির ক্ষেত্রে সম্প্রতি নেতৃত্ব দিচ্ছে উচ্চ প্রবৃক্ষির হার সম্পর্ক সার্বিক শিল্প খাত।

অপরপৃষ্ঠার তালিকার ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ এই তিনি বছরে জিডিপি-তে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের আপেক্ষিক অবদানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে-

২০১৫-১৬ অর্ব বছরের ডিউ মূল্য প্রিভিনি-তে খাতজয়ানি অবস্থার হার (শতাংশ)।

সার্বিক খাতসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
কৃষি	১৫.৭৫	১৪.৭০	১৪.৩০
পিল	৭১.৫৫	৭২.৪২	৭৩.৭২
সেবা	৫০.১১	৫২.৮৫	৫২.৩৮
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০

কালীকা থেকে বোরা বার দে ২০১৭-১৮ অর্ব বছর প্রিভিনিকে সাধারণ কাবে দাখল অবস্থার কাছে দেখা খাত থার ১২ শতাংশ। তার পরেই রাজেছে পিল খাতের অবস্থান থার ৩৩ শতাংশ। সবচেয়ে কম খাত অবস্থানযোগ অবস্থান রাখছে কৃষি খাত থার ১৪ শতাংশ।

কাজ : জ্বালীরভাবে সহজেলভ উৎপন্নারের সাহায্যে কৃষি, পিল ও সেবা খাতের অবস্থান আদর্শন কর।

৮.৪ কৃষি ও পিল খাতের পারম্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রধান একজন ধরী কৃষক। তিনি জমিকে উচ্চ বসনগীল ধান চাষ করেন, গাঁথীর লক্ষ্যস্তর যাচামে সেচের ব্যবহা করেন এবং প্রযোজনীয় তৈরি সাধ করবার ক্ষেত্রে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান-পাটোর জোগ দিয়ে তৈরি বকার কাজে বাজারে সরবরাহ করেন। অসেকেই এই ধান কুন্ন কজে কাশের খাতের খাল্লুর অক্ষে পূরণ করেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আসলা বলতে পারি, কৃষি খাতের ঐতিহ্য ও আনন্দিকারণের জন্য পিল কৃষি সরবরাহ ও সাজের ঘোষণা দেয় পিল খাত। কেবলি পিলের কসাইর জন্য প্রযোজনীয় কাঁচামাল আসে কৃষি খাত থেকে।



কৃষিনির্ভর পিল (পিলিশি)



পিলনির্ভর কৃষি

আমাদের কৃষি ও পিল খাতের পারম্পরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো

আমাদের সেশের অধিকাংশ পিল কৃষিতিত্ত্ব। এ সেশের উচ্চবিদ্যোগ্য পিল বেঙ্গল- পাটি, চা, চারঞ্চা, চিনি ও কাশেজ প্রকৃতি পিল দাখল কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। স্বাই আমাদের সেশে কোন কোন অবস্থে আবশ্যিক পিলাইন কষ্ট, বেঙ্গল- চাকা ও সারামালগোড়ে পাটি পিলা চাইবায় ও সিসেট অবস্থে চাপিয়া; উচ্চবিদ্যে পিলিশি নকে উচ্চে। অসম পিলের কসাইর কলে কাঁচামালের বর্ষিক জাহিদীর কালোনে কৃষি উৎপাদন

বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সংগ্রহ ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের স্কুল শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত স্কুল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে, যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরম্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

কাজ : কৃষি ও শিল্পের পারম্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?
২. কৃষি খাতের উপর্যুক্ত উন্নয়ন কী কী?
৩. কৃষি খাতের উপর্যুক্ত উন্নয়ন কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৩. কৃষি খাত ও শিল্প খাতের পারম্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রমশক্তির কত শতাংশ ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী কৃষি খাতে নিয়োজিত?

ক. ১৯.৯২% খ. ৩০.৩০%

গ. ৪৫.১০% ঘ. ৪৭.৫০%

২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো-

- i. মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি
- ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগামী করা
- iii. করের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুজ্ঞাদটি পড় এবং তা নথর অশ্বের উভয় দাত

মতি তার পরিবার নিয়ে আমে বসবাস করে। সেখানে গ্যাস নেই কিন্তু বিদ্যুৎ আছে। পরিবারের সকলে
যিলে ঠোঁকা তৈরি করে জীবন বাধন করে।

৩. মতিদের কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত?

- | | |
|---------|-----------|
| ক. বৃহৎ | খ. মাঝারি |
| গ. ছুটি | ঘ. কুটির |

৪. মতিদের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে-

- i. সহজপর্তে খুল ধ্রুবালের ব্যবহাৰ কৰাতে হৈন
- ii. বিদেশি দ্রব্যেৰ ব্যবহাৰ কৰাতে হৈবে
- iii. এশিয়াপেৰ ব্যবহাৰ কৰাতে হৈবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল ধন্দ

১. অধীনিতির দুটি ধাত



A (ক্ষেত্ৰ মাঠে শাট কৰিছে)



B (পাটেৱ তৈরি ব্যাপ)

ক. শিল্প কী?

খ. আমাদেৱ দেশে পুঁজি পঠনেৰ হ্যাত কৰ কেন?

গ. 'A' ধাতেৰ উন্নয়নেৰ উপৰ কীভাৱে অধীনিতিক ধৰ্মুকি নিৰ্ভৱশীল-ব্যাখ্যা কৰি।

ঘ. 'A' ও 'B' ধাত পৰম্পৰাৰ পৱিত্ৰৰূপ- মূল্যায়ন কৰি।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের শুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

Important Economic Issues of Bangladesh

বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্নমাত্রাম আয়ের উন্নয়নশীল একটি দেশ। এ দেশের উন্নয়নের পথের সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চতর প্রযুক্তির হার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুব্যবস্থার উন্নয়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন দুর্লভি গ্রাধ এবং সুশাসনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- অর্থনৈতিক প্রযুক্তির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবক্তব্যসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব এবং
- জনসংখ্যা কীভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Economic Growth and Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণা দুটি এক মনে হলেও আসলে এক নয়। এই শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত ছূঢ়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু প্রবৃদ্ধি বোঝায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি তো পাই, উপরত্ব অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন হয় যেমন নাগরিকদের ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

কাজ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

৯.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed, Least Developed and Developing Countries)

উন্নত দেশ: উচ্চ আয়ের যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

অনুন্নত দেশ: অধ্যাপক র্যাগনার নার্কস বলেন, অনুন্নত দেশ হচ্ছে সে সব দেশ, যেগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন বা পুঁজি কম। নিম্ন আয়ভুক্ত এসব দেশে জনসাধারণ নিম্নমানের জীবন যাপন করে।

উন্নয়নশীল দেশ: যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এসব দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৯.২.১ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed Countries)

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ : উন্নত দেশ সাধারণত পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কখনো কখনো এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।
২. মূলধন : উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়।
৩. দক্ষ জনশক্তি : যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। যেমন, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
৪. উচ্চগড় আয়ুক্তাল : উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুক্তাল সাধারণত বেশি হয়। উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে তাদের গড় আয়ুক্তাল বেশি হয়ে থাকে।
৫. কারিগরি জ্ঞান : বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যে দেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত, সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করছে।
৬. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই, সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। অর্থাৎ সে সব দেশে সরকারের পরিবর্তন হলেও অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ও সুশাসন অব্যাহত থাকে।
৭. ভৌত অবকাঠামো তথা উন্নত পরিবহনব্যবস্থা : যেখানে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবহনব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। ভৌত অবকাঠামো তথা পরিবহনব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয়হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কাজ : উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Least Developed Countries)

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এসব অনুন্নত দেশে বসবাস করে।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. কম উৎপাদনশীল কৃষি খাত : অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সন্তানো।
২. কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি : এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।
৩. বেকারত্ব : অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছফ্টবেশী ও মৌসুমী বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।
৪. কম মাথাপিছু আয় : অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।
৫. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র : অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মস্তুর থাকে।
৬. জনসংখ্যাধিক্য : বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে করা যায় না।
৭. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।
৮. অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা : অনুন্নত দেশের পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তরে বিস্তুরণ ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।
৯. প্রতিকূল বাণিজ্যশক্তি : অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসাবে কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক মূল্যে এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।
১০. অনুন্নত শিল্প কাঠামো : অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন মূলধনী শিল্প খুব কম। অনুন্নত দেশের শিল্প খাতে অন্যান্য খাতের তুলনায় শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও কম।

কাজ : উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের তুলনা কর।

উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developing Countries)

উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

১. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি :** দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়, তবে এখানেও কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষিতে বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের প্রভাব থাকে।
২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম কিন্তু অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়।
৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না।
৪. **মূলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। কম সঞ্চয় মূলধন গঠনের পথে অস্তরায়।
৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমনিরিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পণ্য বলতে শিল্পের কাঁচামাল যেমন, পাট, চামড়া ইত্যাদি বোঝায়।
৬. **শিল্পের বিকাশ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও রপ্তানীমুখী শ্রমধন শিল্পের দ্রুত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।
৭. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি :** উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এ দেশগুলোকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।
৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান-পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান-পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝাঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
৯. **অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল :** উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, বিমা প্রত্তি প্রয়োজনের তুলনায় কম।
১০. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকাংশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

৯.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ (Obstacles to Economic Development of Bangladesh)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১. **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্ত্র।
২. **অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষিপণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।
৩. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সম্ভয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।
৪. **উদ্যোক্তার অভাব :** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাণ্ত সম্ভয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না। বিদেশমুখীনতার কারণেও অনেক পুঁজি বাইরে চলে যায়।
৫. **অধিক জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় উৎপাদনের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর ভোগের জন্য ব্যয় হয় ফলে সম্ভয় কম হয়। আর সম্ভয় ও পুঁজির স্বল্পতা উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করে।
৬. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অধ্যাপক নার্কসের মতে, একটি দেশ দারিদ্র কারণ সে দেশ দারিদ্র। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম চাহিদা ও সম্ভয় কম, বিনিয়োগ কম উৎপাদন কম।
৭. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। যেমন- হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও, জঙ্গি হামলা ইত্যাদি। এ অবস্থা অধিকতর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও এতে ব্যাহত হয়।
৮. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য- শর্তের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিদেশিদের প্রভাব আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। তবে সম্প্রতি পোশাক রঞ্জানি বৃদ্ধি এবং প্রচুর রেমিট্যান্সের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা ক্রমহাসমান।

৯. অনুন্নত বাজারব্যবস্থা : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজারব্যবস্থা এখনো যথেষ্ট উন্নত হয় নি। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব এবং মধ্যস্থত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে বাজার দাম সকল ক্ষেত্রে উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।
১০. প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা : উন্নত প্রযুক্তির অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবস্থার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

কাজ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অঙ্গরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।

৯.৪ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Programmes of Non-government Organisations)

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পশ্চীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংস্থাগুলি এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, আশা, প্রশিক্ষণ, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস ও ব্যৱৰো বাংলাদেশ।

১. ব্র্যাক (বাংলাদেশ বুরাগ এডভালমেন্ট কমিটি) : ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রখণ্ডানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। দারিদ্র্য মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে কাজ করে থাকে।
২. স্বনির্ভর বাংলাদেশ : স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসেবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে।
৩. প্রশিক্ষণ : ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিক্ষণ সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশসম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বস্তবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রম চালাচ্ছে।
৪. আশা (এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভালমেন্ট) : আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর ক্ষুদ্র ঋণানকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
৫. শক্তি ফাউন্ডেশন : ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুষ্ট নারীদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব নারীদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

৬. টিএমএসএস (ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংস্থ) : বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।
৭. এসএসএস (সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিসেস) : সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বন্ধিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমর্পিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবন্ধিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।
৮. ব্যৱৰো বাংলাদেশ : এই সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়েন্টিঙ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং দারিদ্র্যের ধারণা, পরিমাপ, প্রবণতা এবং কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায়, সে বিষয়ে জানা দরকার।

দারিদ্র্য ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্য একটি বহুমুখী আপেক্ষিক বিষয় (Multidimensional and Relative). সমাজে যারা অন্যদের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে কম আয় করেন, কম ভোগ করেন, কম সম্পদের মালিক, কম শান্তিতে আছেন এবং সর্বদাই নিজেদেরকে অ-ক্ষমতাবান ও বিপন্ন বোধ করেন, তাদেরকেই সাধারণত দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকেই দরিদ্র বলে থাকি, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণটুকু যোগাড় করতে পারেন না। সেরকম ন্যূনতম আয়সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে দরিদ্র পরিবার হিসেবে ধরা হয়। দরিদ্রদের মধ্যে যারা আরো হত দরিদ্র, তাদেরকে চৰম দরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিচের তালিকায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিমাপ, হার ও গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হলো।

সারণি-১

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫	২০১০	২০১৬
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪০.৪	৩১.৫	২৪.৩
	পল্লি	৪৭.১	৩৯.৫	৩৫.২	২৬.৪
	শহর	৪৯.৭	৪৩.২	২১.৩	১৮.৯
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৫.১	১৯.৫	১৭.৬	১২.৯
	পল্লি	২৪.৬	১৭.৯	২১.১	১৪.৯
	শহর	২৭.৩	২৪.৮	৭.৭	৭.৬

বাংলাদেশে দারিদ্র্য গতিধারা (Poverty Trends of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলত বিভিন্ন পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫, ২০১০ এবং ২০১৬ এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র্য গড় বার্ষিক ৪.২৩ পয়েন্ট শতাংশ হারে (Point Percentage Rate) হ্রাস পায়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে ৮.৭ শতাংশ হারে।

দারিদ্র্য নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম (Programmes Adopted for Poverty Alleviation)

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবধিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র খণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

- (ক) নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
- (খ) নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
- (গ) খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম;
- (ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সূচির লক্ষ্য ক্ষুদ্র খণ কার্যক্রম

ক. নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রমসমূহ (বিভিন্ন ভাতা)

দেশের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বয়স্ক জনগণ এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুষ্ট নারী। তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুষ্ট নারী ভাতা চালু করেছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু করেছে।

খ. নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ)

বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু বিশেষ নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। এসিডদফ্ফ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য, ক্ষুদ্রক্ষণ কার্যক্রম, অসচল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা এবং দারিদ্র্য মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এ ধরনের কার্যক্রম।

গ. খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম

দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্যনিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজের বিনিয়য়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ কর্মসূচি এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া সমবায় সমিতি গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৯.৬ বেকারত্ব (Unemployment)

বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of Unemployment)

কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না- এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- (১) মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না,
- (২) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক,
- (৩) আয় উপার্জন থেকে বঞ্চিত,
- (৪) আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

বেকারত্ত্বের প্রকৃতি (Types of Unemployment)

১. **মৌসুমি বেকারত্ত্ব :** প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ত্ব হয়। যেমন ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বাধিত হয়, সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।
২. **ছদ্মবেশী/প্রচল্ল বেকারত্ত্ব :** কৃষি খাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেই প্রাণিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রাণিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচল্ল বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষবাস করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতে চামের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত, দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত দুজন লোকের প্রাণিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং এই দুজন শ্রমিককে প্রচল্ল বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে প্রচল্ল বেকারত্ত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাতদৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রাণিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।
৩. **সাময়িক বেকারত্ত্ব :** পেশা পরিবর্তনের সময়ে যে বেকারত্ত্ব তৈরি হয়, তাকে সাময়িক বেকারত্ত্ব বলা হয়। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে কয় দিন সে কর্মহীন থাকে, এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ত্ব বলে গণ্য হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ত্ব লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ত্ব দেখা দেয়।

বেকারত্ত্ব নিরসন (Reduction of Unemployment)

বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলি চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন— গবাদিপশু পালন, বনায়ন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামীণ গ্রহ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোট খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব ছাড়াও বেকারত্ত্ব নিরসনের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

১. ছদ্মবেশী বেকারত্ব নিরসন : অনুমত দেশের কৃষিব্যবস্থায় ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। কৃষি খাতের শ্রমিকের মজুরির চেয়ে শিল্প খাতে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করলে শিল্প খাতে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পায়। আর কৃষি খাত থেকে উদ্ভৃত বেকার শ্রমিক শিল্প খাতে স্থানান্তর হয়। এই পদ্ধতিতে আমরাও বাংলাদেশে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করতে পারব।
২. মূলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব নিরসন : উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে শিল্পের উন্নয়ন ও পরবর্তী সময়ে শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়ন করলে শ্রমিকের প্রাণ্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বাংলাদেশেও বেকারত্বহাস পাবে।
৩. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন : কৃষি খাতে যে সকল ছোট যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলো কৃষিভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত করা যায়। আর এ ধরনের শিল্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করা যায়।
৪. গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন : কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মোট কথা দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে।
৫. কৃষিজমিতে বহু ফসল উৎপাদন-ব্যবস্থা : বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষিজমিতে একটি ফসল উভেদেনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে কৃষি শ্রমিক বেকার থাকবে না।
৬. ফসলবহুবৃত্ত কৃষি : বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জমি রয়েছে। এসব জায়গায় বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করা যায়। আর উচ্চ অর্থচ ফসল হয় না এমন জায়গায় হাঁস-মুরগির খামার করে বছরের সব সময় কাজ করার সুযোগ হয়।
৭. অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মসূচী বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনসিটিউট স্থাপন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।
৮. পর্যাণ পরিমাণ ঋগসুবিধা : গ্রামীণ অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋগসুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদিপশু খামারের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

অনুসন্ধান কাজ: তোমার এলাকার বেকারত্ব পরিস্থিতির উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি কর।

৯.৭ মানবসম্পদ (Human Resource)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

মানবসম্পদের সংজ্ঞা (Definition of Human Resource)

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। তবে কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবশক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি (Methods of Human Resource Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে নিচের পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে।

- শিক্ষা :** জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাষি হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ উদ্দেশ্যে দেশের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করা দরকার। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে।
- প্রশিক্ষণ :** দেশের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক উন্নত প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

৩. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন : সুষম খাদ্য গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।
৪. খাদ্য ও পুষ্টি : দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতন করে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ডাঙ্কার, বিজ্ঞানী, কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকেরই দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।
৫. উপযুক্ত বাসস্থান : স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে করতে হবে।
৬. নারীর ক্ষমতায়ণ : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে কর্মে নিয়োজিত করার উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে কর্মযুক্তী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।
৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা : বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মানবসম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

[এই অধ্যায়ের যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।
২. প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুবিয়ে লিখ।
৩. অনুমত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৪. উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ কী?
৬. কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ কর।
৭. বেকারত্রের ধারণা দাও।
৮. বেকারত্রি নিরসনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।
২. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? বর্ণনা কর।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ বর্ণনা কর।
৪. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উন্নয়ন কী?

- | | |
|------------------------|--|
| ক. প্রবৃদ্ধির একটি অংশ | খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি |
| গ. জাতীয় আয় বৃদ্ধি | ঘ. প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল |

২. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে

- i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে
- ii. প্রচন্ড বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
- iii. জীবননির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

করিম একটি ভাড়া করা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্যে ব্যাংক খণ্ডের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?

ক. দারিদ্র্যের গতিধারা খ. দারিদ্র্য বিমোচন

গ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ঘ. দারিদ্র্য ত্রাস

৪. নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের

i. বেকারত্ব দূর হবে

ii. মূলধন গঠিত হবে

iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে

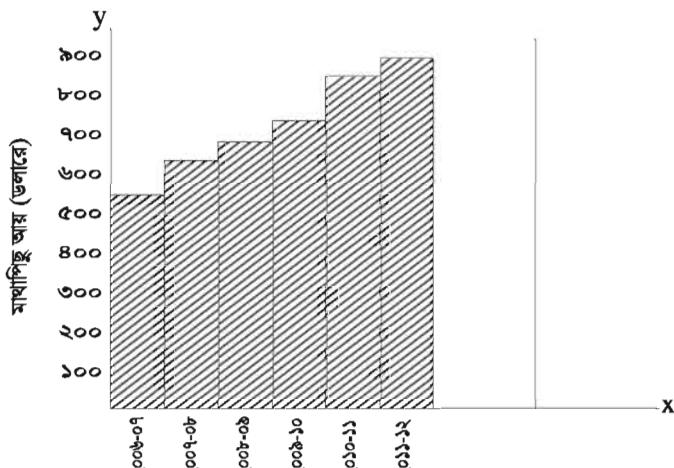
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (জুন/১২)

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

২. তামাঙ্গা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকরি হয়নি। ইদানীং
সে তার মাঝের পরিচালিত হস্তশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মাঝের কাছে থেকে তার সময়
ভালো কাটে কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে?

খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।

গ. অর্থনীতিতে তামাঙ্গার কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা’ তামাঙ্গাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে— মূল্যায়ন কর।

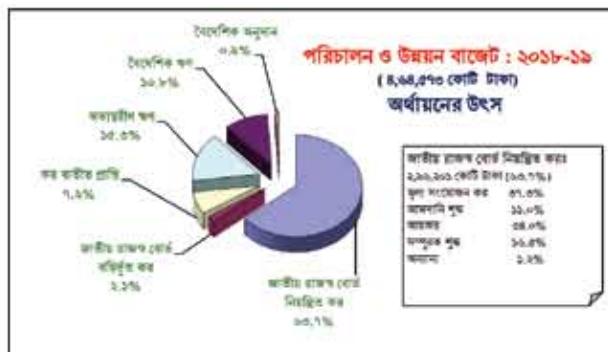
দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

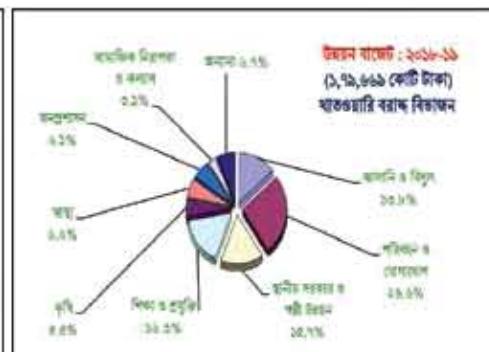
The Public Finance of Bangladesh Government

বাংলাদেশ সরকারের দেশের অগ্রাসন পরিচালনা, আইনগৃহিত রক্ষা, বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণসূচক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সংস্থানের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ আর করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের সম্মত্ব্য সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীকে বাজেট বলে। আর এসব বিষয়ের আলোচনা সরকারি অর্থব্যবস্থার হত্তে থাকে।

চিত্র : সরকারি আয়ের উৎসসমূহ ও সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহ



আয়ের উৎসসমূহ



ব্যয়ের খাতসমূহ

এ অধ্যায়ের পাইপিংয়ে আমরা—

- সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চলাতি বাজেট ও ঘূর্ণধন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- সুব্দ বাজেটের সাথে অসম বাজেটের মূলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর প্রেরণবিভাগ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব এবং
- জাতীয় বাজেটের আলোচনার অংশগ্রহণে উসাধি হতে পারব।

১০.১ সরকারি অর্থনৈতিক (Public Finance)

অর্থনৈতিক হে শাখার সরকারের আয়, ব্যয় ও বিষয়সমূহ বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থনৈতিক বলে। একটি দেশের অসমাধানের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সম্মতির জন্য সরকার কোন কোন কীভাবে, কোন সীমিতে ব্যয় করবে, তা সরকারি অর্থনৈতিক আলোচনা করা হয়। সরকারি ব্যয় নির্বাচনের জন্য কীভাবে, কোন কোন উৎস হতে আয় করবে অথবা কোন উৎস থেকে কফটুকু খণ্ড প্রদান করবে, তা সরকারি অর্থনৈতিক আলোচনা করা হয়।

১০.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ একটি নির্বাচিত আজ্ঞার দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অন্তর্জাতিক সাধন, অধিগৃহ পরিচালনা, দেশ বাস্ত ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাচনের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি (ব্যা- ব) কর বাজেব ব) করবিহীন কাজে

ক) কর বাজেব (Tax Revenue)

সরকার অনগ্রহের নিকট হতে বাধ্যকানুনকারে হে অর্থ আপাত করে কিন্তু তার বিনিয়োগ অনগ্রহ সরকার থেকে সরাসরি বিলের হোস্তে সুবোধ-সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিরাপত্তি বা অনিরাপত্তি ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তিক ও পিছের প্রতিক্রিয়া এবং পশ্চের উপর হে কর ধার্য করে, তা থেকে শোষ আয়কে কর বাজেব বলা হয়।



সরকারের কর বাজেবের উৎসসমূহ হলো-

জাতীয় কর

১. আয় ও মুদ্রাকার উপর কর (Taxes on Income and Profit)

কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের উপর হে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে কোম্পানি বাসীক ব্যক্তিগত করদাঙ্গা বাসের বার্ষিক বৈট আয় ২,৫০,০০০ টাকা (পুরুষদের ক্ষেত্রে); ৩,০০,০০০ টাকা (মহিলাদের এবং ৬৫ বছর বা অধিক বয়সের মুক্তব্যের ক্ষেত্রে); ৩,৭৫,০০০ টাকা (প্রতিবার্ষীদের ক্ষেত্রে) এবং ৪,২৫,০০০ টাকা হলো (যুক্তিবোকাদের ক্ষেত্রে) আয়ের আয় কর ধার্য করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুদ্রাকার উপর কর ধার্য করা হয়ে থাকে।

২. মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)

অন্যান্য টেলিক ও টেলিফোনীয় দেশের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে জু করে চূড়ান্ত মূল্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জন অঙ্গকরণ করতে হয়। উৎপাদনের এক্সপ বিভিন্ন ক্ষেত্র থে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট খাজে থে কর আয়োগ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে।

বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

৩. আমদানি শুল্ক (Custom Duties)

বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো আমদানি শুল্ক। দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে।

৪. আবগারি শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্প্রিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৫. সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duties)

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করে, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। যেমন, সিরামিক টাইলসের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক।

৬. অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)

উপরের শুল্ক ও করের মূল পাঁচটি উৎস ছাড়াও আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে। যেমন : সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি।

৭. মাদক শুল্ক (Narcotics and Liquor Duty)

মাদকজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর সরকার শুল্ক বসিয়ে অর্থ আয় করে থাকে। এর মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

৮. যানবাহন কর (Tax on Vehicles)

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর যে কর দেওয়া হয়, তাকে যানবাহন কর বলে। এ খাত থেকে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে।

৯. ভূমি উন্নয়ন কর (Land Development Tax)

ভূমির মালিকানা ও ভোগদখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকার ভূমির উপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে।

১০. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp)

দলিলপত্র ও মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়। এ খাত হতে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে।

খ) করবহির্ভুত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরও অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে করবহির্ভুত রাজস্ব বলে।

সরকারের করবহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১. লভ্যাংশ ও মুনাফা (Dividend and Profit)

সরকার তার মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্ক, চিড়িয়াখানা) থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে।

২. সুদ (Interest)

সরকার, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে খণ্ড প্রদান করে। প্রদত্ত খণ্ডের সুদ হিসেবে সরকার প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে।

৩. প্রশাসনিক ফিস (Administrative Fees)

সরকার জনগণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করে থাকে। যেমন- কোর্ট ফিস।

৪. জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াঙ্গকরণ (Fine, Penalty and Confiscation)

দেশের আইন ও নিয়মনীতি পরিপন্থী বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াঙ্গকরণ করে প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক সেবা (Economic Services)

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রঙ্গানি আইনের আওতায় প্রাণ্তি ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাণ্তি রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিমা আইনের আওতায় প্রাণ্তি ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি।

৬. ভাড়া ও ইজারা (Rent and Lease)

সরকারি বিভিন্ন সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে।
যেমন : হাট, ঘাট।

৭. টোল ও লেভি (Toll and Levy)

বিভিন্ন সেতু থেকে টোল ও লেভি আদায় বাবদ সরকার কিছু অর্থ আয় করে থাকে।
যেমন : সেতুর জন্য টোল আদায়।

৮. অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় (Non Commercial Sales)

সরকার জনগণের কল্যাণে কোনো কোনো সময় বিনা লাভে অনেক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। যেমন :
ও.এম.এস বা খোলা বাজার বিক্রয় নীতি।

৯) রেলওয়ে (Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে বাণিজ্যিক ও স্বত্যাক্ষরী পরিবহনের ভাঙ্গা বাবদ আয় করে। রেলওয়ে সেবাকে সম্প্রসারণ, আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে এ খাতে মূলাঙ্কার পরিমাণ কিছুটা বৃক্ষি পেয়েছে।

১০) ডাক বিভাগ (Postal Department)

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের একটি উৎস। ডাক বিভাগ বহুমুখী সেবা প্রদান করার ফলে ২০০১-০২ সাল হতে এ খাতে আয় প্রবাহ কিছুটা বৃক্ষি পায়।

উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ থেকে প্রাণ্ট আয়ের পরিমাণ অধিক নয়। তাই প্রতিবছর সরকারকে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশি খণ্ড, সাহায্য, মান, অনুদান এসবের উপর নির্ভর করতে হয়।

কাজ ১ : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ ২ : বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃক্ষির উপায় চিহ্নিত কর।

১০.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ একটি নিম্নমাধ্যম আয়ের জনকল্যাণবানী রাষ্ট্র। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশ বক্ষ ও পরিচালনা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও উন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি জ্ঞাপন বৃক্ষি পায়েছে। যার ফলে অনেক নতুন নতুন খাতও ব্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের শাখান খাতসমূহ

১. শিক্ষা ও অ্যুক্তি

সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাজ-ছাজীদের মেধা বিকাশে বৃত্তিসংখ্যা ও হার বৃক্ষি এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাপত্রি বৃক্ষির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর ভূষ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে।

২. প্রতিরক্ষা

দেশকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য যুক্তের সাজ-সরঞ্জাম অন্য, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেঙ্গলভাড়া, বাসস্থান ও তিকিস্তা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খাতে অনেক ব্যয় বরাবর অধিকাখিত থাকে।



লৌ-ভৰী

৩. অন্তর্বিভাগ

বাণি পরিচালনার জন্য সরকারকে অন্তর্বিভাগ পরিচালনা করতে হয়। অপ্রাপ্তির বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।



বাংলাদেশ সচিবালয়

৪. অন্তর্ভুক্তি ও নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্তর্গতের জনমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী গঢ়ে ফুলতে ও পরিচালনা করতে এবং ভাদের বিভিন্ন অলিঙ্গ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সরকারকে ধূচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।



কৃষিকাজ

৫. কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা

বাংলাদেশ সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি খাতে ডকুমেন্ট পরিমাণ ক্রমাগতে বৃদ্ধি এবং খণ্ড বিতরণ করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সরকার অন্যম কৃষি গবেষণার জন্য ব্যাপক দেওয়া অনু করেছে।

৬. অন্তর্বাহ্য

অন্তর্গতের সূচিকর্তার জন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ ছাপন, বিনায়ুল্য অনুধ প্রদান, যাহামারী প্রতিরোধ, ভাস্কার ও নার্সের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসাসেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেখান্ত জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ কমপ্লেক্স ছাপন এবং সেখানে একজন করে এম.বি.বি.এস ভাস্কার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যবের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায়, সুবিধাবিহীন জনগোষ্ঠীর জীবনধারারের ন্যস্তত্ব প্রত্যোজন যোগাতে বাংলাদেশ সরকার সার্বৰ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাবৈঠনী কর্মসূচী, বেদন : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, বিশ্বাভাতা, পাসিফিসিজ নারী ও শারীরিক প্রতিবাসীদের পুর্ণব্যাসন, অসচ্ছল যুক্তিযোক্তাদের বাস্তুর সম্মানীভাতা, প্রাকৃতিক ও তৌলোগিক কার্যক্রম সৃষ্টি সামগ্রিক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তত্ত্ববিল এবং বাস্তুবাহা গৃহায়ন তত্ত্ববিল, একশ মিনের কর্মসূচন কর্মসূচি, একটি বাঢ়ি একটি খামার এবং পরিব-দূষণের মাঝে বেশনি কাজে সরকার ধূচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৮. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চয়ন বৃক্ষিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল গঠন প্রভৃতি খাতে প্রতিবহন সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।



বিদ্যুৎ সরবরাহ

৯. পরিবহন ও বোগাবোগ

বাংলাদেশের বাতারাত, বোগাবোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার বোগাবোগ, সড়ক, রেলপথ, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ভাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সেচু বিভাগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

১০. দানিজ্য বিমোচন ও কর্মসংহান

'ন্যাশনাল সার্কিস' প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প শিক্ষিত, কর্মী ও বেকার যুবকদের জন্য অস্থায়ী নিয়ন্ত্রিত নানাকাণ্ড কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংহানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমীর অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), ডিজিএফ ও ডিজিডি বাবদ প্রতিবহন সরকার ১০ লাখ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংহান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুরূপে স্ফূর্ত ধরণ প্রদান করতে হচ্ছে। এসব খাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

১১. খণ্ড ও সুন্দর পরিশোধ

সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রচুর পরিমাণে খণ্ড গ্রহণ করে। এসব খণ্ড এবং খণ্ডের সুন্দর পরিশোধ করতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

১২. শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ

দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শব্দ ও কর্মসংস্থান এবং প্রাচীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এই ব্যয় করে থাকে। কৃষি ও মানুষী শিল্প খাতে কৃষি উদ্যোগসমূহের খণ্ড বিভাগে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুন-অর্থায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।



বহুশিল্প

১৩. পরিবেশ ও বন

পরিবেশ সংরক্ষণ-মালোন্নয়ন, শিল্পস্থগ্র থেকে রক্তা, তবল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি নানামূর্তী কর্মকাণ্ড বাত্তবারনের জন্য সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ ব্যয় করে।

১৪. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সরকার দেশের তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বুব ও ঝীড়ার উন্নয়নে প্রতিবহন অন্তেক অর্থ ব্যয় করে থাকে।

১৫. জ্ঞানীয় সরকার ও পন্থি উন্নয়ন

জ্ঞানীয় সরকার বিভাগ, পন্থি উন্নয়ন ও সমৰায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

উন্নিষিত খাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরও করেকটি খাতে ব্যয় করে, যেমন- মহিলা ও শিশু, পানিসংস্কার, যন্ত্র ও আলিসংস্কার, শৃঙ্খল, খাদ্য ও দুর্বোগ ব্যবস্থাপনা। সরকারি হিসাব অনুবাদী ১৫
বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব বা

অনুময়ন ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৫৫টি খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রায় ১৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ধারণার আলোকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, অনুময়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়হাস করে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি আরও প্রসারিত করা উচিত।

কাজ ১ : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারি অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি কর।

কাজ ২ : সাম্প্রতিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ কর।

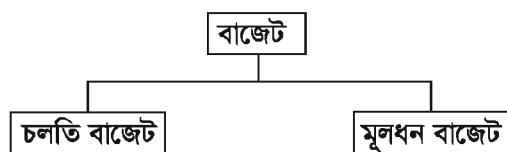
১০.৪ বাজেট (Budget)

বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের সুবিন্যস্ত হিসাবকে বোঝায়। ব্যক্তি তার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় পায় তা কীভাবে ব্যয় করে তা যদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়, তা হবে ব্যক্তিগত বাজেট। একইভাবে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে কতটুকু আয় প্রাপ্তির আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে চায়, তার সুবিন্যস্ত হিসাবকে সরকারি বাজেট বলে। বাংলাদেশে আর্থিক বছর হলো জুলাই থেকে জুন।

বাজেট হলো সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। বাজেটে যেমন সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি দেশের অর্থনীতির চিত্র ফুটে ওঠে। বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না বরং আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অস্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি পূরণ হবে এবং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।



চলতি বাজেট (Current Budget)

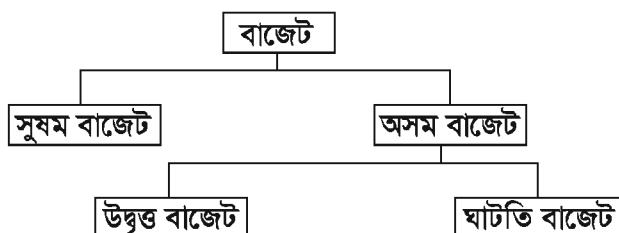
যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগ্রহীত হয় কর রাজস্ব ও করবহির্ভুত রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-মূল্য সংযোজন কর, আয়কর, সম্পত্তি কর ও ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। করবহির্ভুত রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, খণ্ডের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন-শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকে, তাই প্রতিবছর বাজেটে এ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চলতি বাজেট সাধারণত উদ্বৃত্ত থাকে। চলতি বাজেটকে অ-উন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেটও বলা হয়।

মূলধন বাজেট (Capital Budget)

সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো- রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বেসরকারি সঞ্চয় ব্যাংক খণ্ড ও অতিরিক্ত কর ধার্য করা ইত্যাদি। আর বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো-বৈদেশিক খণ্ড, বৈদেশিক অনুদান ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

কাজ : চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :



১. সুষম বাজেট (Balanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির ফর্মা-১৯, অর্থনীতি, ৯ম-১০ শ্রেণি

সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে এটি সহায়ক নয়।

সূত্র :

সুষম বাজেট = মোট আয় - মোট ব্যয় = ০ হয়।

অর্থাৎ, মোট আয় = মোট ব্যয়।

২. অসম বাজেট (Unbalanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) উদ্ধৃত বাজেট (Surplus Budget)

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

ক) উদ্ধৃত বাজেট (Surplus Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে, তাকে উদ্ধৃত বাজেট বলে। অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি।

সূত্র : উদ্ধৃত বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) > ০ হয়।

অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দ্রু করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে খণ্ড, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে খণ্ড, বৈদেশিক খণ্ড ও অনুদান গ্রহণ করে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

সূত্র : ঘাটতি বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) < ০ হয়।

অর্থাৎ, মোট আয় < মোট ব্যয়।

কাজ ১ : উদ্ধৃত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

কাজ ২ : সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

১০.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই-জুন। অতিবাহু জুন মাসের অন্তর্ম সঞ্চাহে মানবীয় অর্থব্যবস্থা যথান জাতীয় সংসদে গৱর্বণী বাহরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন, যা আলোচনা, সমালোচনা এবং অমোজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিমোচনের পর উক্ত মাসেই যথান সংসদে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।



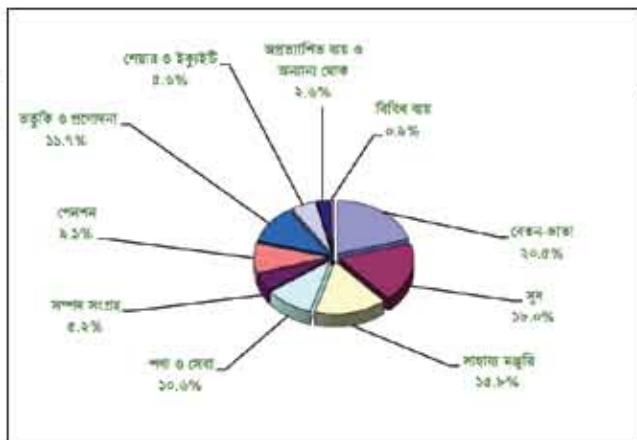
জাতীয় সংসদ

আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

- ১) অ-উন্নয়ন বাজেট বা চলতি বাজেট বা রাজস্ব বাজেট।
- ২) উন্নয়ন বাজেট বা মূলধন বাজেট।

১) অ-উন্নয়ন বাজেট (Non-Development Budget)

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হব এবং বাজেটের বাবের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত নহ, তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ বৃক্ষ এবং দেশের শিশুসন সুস্থিতার পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না।



অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ

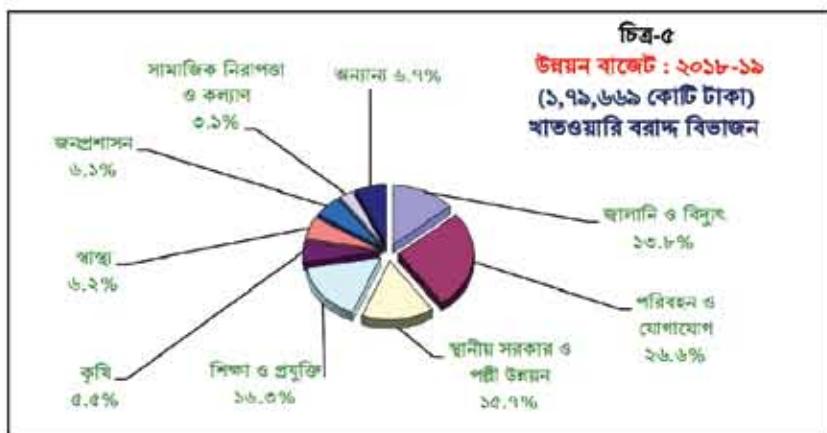
অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় মূলত কর ও করবহির্ভুত রাজস্ব হতে। আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ :

কর থেকে আয়	করবহির্ভুত আয়
আয় ও মুনাফার উপর কর মূল্য সংযোজন কর (VAT)	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা সুদ থেকে প্রাপ্ত
আমদানি শুল্ক আবগারি শুল্ক সম্পূরক শুল্ক	প্রশাসনিক ফি জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াঙ্করণ সেবা বাবদ প্রাপ্তি
ভূমি রাজস্ব যানবাহন কর স্ট্যাম্প বিক্রয়	ভাড়া ও ইজারা টোল ও লেভি রেলওয়ে
নন-জুডিশিয়াল মাদক শুল্ক অন্যান্য কর ও শুল্ক	ডাক বিভাগ তার ও টেলিফোন বোর্ড অন্যান্য করবহির্ভুত রাজস্ব

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ	
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা
জনপ্রশাসন	ঝণ ও সুদ পরিশোধ
প্রতিরক্ষা	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
পরিবহন ও যোগাযোগ	অপ্রত্যাশিত ব্যয়

২) উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)

বাজেটের যে অংশে উন্নয়নসূচক কার্ডত্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে উন্নয়নমূলক বা মূলধন বাজেট বলে। এ বাজেটে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংহালের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। উন্নয়ন বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তি অর্জন। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিতে হয়।



বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ :

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের খাতসমূহ
অভ্যর্তবীণ উৎস :	<ol style="list-style-type: none"> কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন জাতীয় সরকার ও পান্তি উন্নয়ন পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শিক্ষা ও প্রযুক্তি বাজেট উন্নয়ন পানিসংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ গৃহায়ণ শস্য ও জনপক্ষি মহিলা ও চূব উন্নয়ন অন্যান্য
বৈদেশিক উৎস:	
১. বৈদেশিক সাহায্য	
২. বৈদেশিক ঋণ	

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় কর।

১০.৬ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বর্তমান বাজেট এবং বিগত অর্থবছরের (২০১৭-১৮) সংশোধিত বাজেট:

এক নজরে বাজেট

(অর্থসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট (২০১৮-১৯)	সংশোধিত বাজেট (২০১৭-১৮)
ক.জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ গ. কর ব্যতিত প্রাপ্তি	২,৯৬,২০১ ৯,৭২৭ ৩৩,৩৫২	২,২৫,০০০ ৭,২০২ ২৭,২৫২
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ)	৩,৩৯,২৮০	২,৫৯,৮৫৮
ক. অনুনয়ন রাজস্ব ব্যয় খ. উন্নয়ন ব্যয় গ. অন্যান্য ব্যয়	২,৫১,৬৬৮ ১,৭৯,৬৬৯ ৩৩,২৩৬	১,৯৩,৮২৮ ১,৫৩,৬৮৮ ২৩,৯৭৯
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	৪,৬৪,৫৭৩	৩,৭১,৪৯৫
সামগ্রিক ঘাটতি (আয়-ব্যয়)	-১,২৫,২৯৩	-১,১২,০৮১
ক. বৈদেশিক উৎস খ. অভ্যর্তীন উৎস	৫৪,০৬৭ ৭১,২২৬	৪৬,০২৪ ৬৬,০১৭
মোট অর্থসংস্থান (ক+খ)	১,২৫,২৯৩	১,১২,০৮১

[উৎস: অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ২০১৮-১৯]

এ বাজেট প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে। যথা- অনুনয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। আয় ব্যয়ের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বাজেট হলো ঘাটতি বাজেট।

কাজ : বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
২. মূল্য সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়?
৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়?
৪. মূলধন বাজেট বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা কর।
৩. সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির ওপর আয়কর ধার্য হয়?

- ক. ব্যক্তির আয়ের ওপর
গ. যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর
- খ. আমদানিকৃত দ্রব্যের আয়ের উপর
ঘ. ভূমি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

২.



চিত্র : A



চিত্র : B



চিত্র : C



চিত্র : D

- কোনটিতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ রয়েছে?

- ক. চিত্র : A খ. চিত্র : B
গ. চিত্র : C ঘ. চিত্র : D

নিচের সারণিটি পত্রে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি আর্থিক বছরে দুটি দেশের সরকারের গৃহীত বাজেট:-

দেশ-A	
প্রত্যাশিত আয় (টাকা)	প্রত্যাশিত ব্যয় (টাকা)
১০০০ কোটি	১১০০ কোটি

দেশ-B	
প্রত্যাশিত আয় (ডলার)	প্রত্যাশিত ব্যয় (ডলার)
২০ লাখ বিলিয়ন	২০ লাখ বিলিয়ন

৩. B দেশের বাজেটকে কোন প্রকারের বাজেট বলে?

৪. A দেশের মতো বাজেট প্রণয়নের ফলে

- i. প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে
 - ii. জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে
 - iii. দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ୍?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, i ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. ইসরাত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। সে কেনাকাটা শেষে দাম পরিশোধ করে তাকে প্রকৃত দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “এটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা হয়।”

- ক. ভূমি উন্নয়ন কর কাকে বলে ?

খ. সম্পূরক শুল্ক কী ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসরাতের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি রাজস্বের কোন উৎসের অন্তর্গত ?
ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্পের লভ্যাংশের সাথে ইসরাত প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. জাহিদ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে। তাদের স্কুলের সবাই খুশি। কারণ এ বছর একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। সে জানতে পারে, সরকার এবার তাদের স্কুলে বড় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাদের বেতনের মতো এটিও সরকারের এক ধরনের ব্যয়, যা বাজেটের মাধ্যমেই সরকার প্রদান করে।

- ক. বাজেটের সংজ্ঞা দাও ।
খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় ?
গ. জাহিদের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের কাজটি সরকারের কোন বাজেটের অন্তর্গত ? ব্যাখ্যা কর ।
ঘ. জাহিদের ক্ষেত্রে মত বাজেট দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে । বিশ্লেষণ কর ।

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
৯ম-১০ম অর্থনীতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যযী কখনও দরিদ্র হয় না

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য